আহারে বিষ মগজে বিষ

শিবব্রত পট্টনায়ক

আহারে বিষ মগজে বিষ

শিবব্রত পট্টনায়ক

পত্রলেখা
৯/৩ টেমার লেন কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৫
প্রকাশক : গুণেন শীল পত্রলেখা ৯/৩ টেমার লেন কল ৯
মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস গোয়াবাগান স্ট্রীট কল ৬
অক্ষরবিন্যাস : ভাষাশিল্প কল-৩৬
প্রচ্ছদ : সুবল সরকার
দাম : ৩৫.০০

দুটি কথা

এই বইয়ের সমস্ত লেখাই সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। জীবিকাসূত্রে প্রতিদিন অনেক মানুষোর সঙ্গে কথা বলতে হয়, আর এভাবে কথা বলতে বলতেই লেখার সমস্ত বিষয় জোগাড় হয়ে গিয়েছে। এরপর শুধু চেষ্টা করেছি বিষয়গুলি বোঝার আর জানার। লেখাগুলির 'সহায়ক' অনেক। সবাইকে আলাদা করে উল্লেখ করার পরিসর এখানে নেই, তাই এই সুযোগে সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম।

লেখাগুলির প্রায় সবই বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি প্রবন্ধের কোন একটি বিষয় অন্য প্রবন্ধেও উল্লেখিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি পড়লে এর কারণ পাঠকের অজানা থাকবে না।

পরিশেষে, প্রতিটি পাঠকের কাছে লেখকের বিনীত অনুরোধ -- লেখাগুলির কোন বিষয় নিয়ে দ্বিমত থাকলে, প্রশ্ন থাকলে, আলোচনা করার ইচ্ছা হলে অবশ্যই লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। লেখক জানার আর শেখার জন্য সব সময়ই উৎসুক।

নমস্কারান্তে —

১বৈশাখ, ১৪১২

শিবব্রত পট্টনায়েক
২৬/৫, নয়াসড়ক রোড
গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সূচি

অথ খাদ্যা খাদ্য কথা

গ্রীষ্মপ্রধান একটি দেশের ভ্যাপসা গুমোটের একটি রাজ্যে আমরা বাস করি। এখানে বছরে নয় মাস তাই কম-বেশি সেদ্ধ হওয়া আমাদের বিধিলিপি। ভিড়-ভাট্টাময় বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে, মেলা-ঘাটে চলার সময় সামান্য দু-এক টাকায় কেনা চমৎকার শীতল মিষ্টি বরফ চুষতে পেলে ঘাম প্যাচপেচে জামায় ঢাকা, নুন ফোটা শরীরটাকে তো একটু আরাম দেওয়া যায়! তাছাড়া বরফ আর লেবুর রস মেশানো মিষ্টি, ঠাণ্ডা আখের রস বা সরবৎ স্টলের বেলের সরবৎ দু-এক গেলাস খেলেও তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। কিছু না মিললে নুন-লঙ্কা মাখানো কাটা শশা অথবা কয়েক টুকরো মিষ্টি পেঁপে বা তরমুজ তো রাস্তার ধার থেকে কিনে খাওয়াই যায়। আর পকেটে দশ-বিশ টাকা থাকলে দোকানে ঢুকে কয়েকটা তেলেভাজা আর মিষ্টি খেয়ে এক বোতল ফ্রিজ প্রত্যাগত ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে গলা ভেজাতে পারলে তো কথাই নেই। এরপর সন্ধের মুখে রাস্তার মোড়ে গিয়ে ফ্রি টকজল সহযোগে ফুচকা, সস মাখানো সিঙ্গাড়া অথবা এগরোল খাওয়ার কথা ভাবলেও আমাদের রসনা রসসিক্ত হয়ে যায়। এইতো সেদিন এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে বলতে শুনলাম, "ফুচকা-আলুকাবলি খাওয়ার মজা না থাকলে জীবনে আর থাকল কি?"

সত্যিই তো, খাওয়ার মজা না থাকলে জীবনে আর কিই বা অবশিষ্ট থাকবে! এই মজাতে আমরা মজে আছি, থাকবোও। তবু 'মজার খাবার' খাওয়ার আগে খাবারগুলোর কথা একটু ভাবলে ক্ষতি কি?

* প্রায় সমস্ত রকমের পলিথিন মোড়া রং-বেরং -এর 'পেপসি' অথবা 'বরফ' তৈরি করতে যে রং ব্যবহার করা হয় তার প্যাকেটের ওপর লেখা থাকে "For industrial use only." — না বরফ তৈরি করার industry নয়, সুতো, কাগজ বা অন্যান্য জিনিসপত্র রং করার industry-র জন্য ঐ রং তৈরি। বিভিন্ন রাসায়নিকের মিশ্রণ-উদ্ভুত এই ধরনের প্রতিটি রং-ই বিষাক্ত। শরীরে প্রবেশ করে এদের কেউ কেউ লিভারের ক্ষতি করে (Hepatotoxic), কেউ স্নায়ুকোষের ক্ষতি করে (Neurotoxic), কেউ মুত্রযন্ত্রের (Kidney) ক্ষতি করে, কেউ আবার চামড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ হয়। আমাদের দেশের গরীব বাবা-মায়েদের প্রায়ই দেখা যায় পরম আদরে তাদের শিশুদের মুখে এই বিষগুলি তুলে দিতে। আর বাসে বা ট্রেনের কামরায় বিক্রি হওয়া লেবু-গন্ধী মুখরোচক লাল-হলুদ-কমলা রঙের লজেন্স হল এরকম আরেকটি উদাহরণ।

* সরবৎ স্টলে থরে থরে সাজানো থাকে বেল, ভ্যানিলা, কমলালেবু, স্ট্রবেরী ইত্যাদির গন্ধে ভরপুর লোভনীয় রঙ্গিন সরবৎ। বরফ মেশানো এই সরবৎ গলায় ঢালার মজা কাউকে বোঝানো যাবে না! তবে দূষিত জল, কেমিকেল-জাত কৃত্রিম গন্ধ আর মারাত্মক বিষাক্ত সব রং দিয়ে তৈরি এই সরবৎ পান করে যতোই তৃপ্তি পাওয়া যাক না কেন, তৃপ্তি করে খেলেও বিষ, বিষই থাকে। যথারীতি পরে একসময় লিভার, কিড়নি বা গায়ের চামড়া এর উত্তর দেবে।

* বহুজাতিক কোম্পানীগুলির প্রচারের দশচক্রে ঠাণ্ডা পানীয়ের ভূত হয়ে গেছে ভগবান। খুব জোর দিয়েই একথা বলা যায় — শুধুমাত্র কতকগুলি কেমিকেল দিয়ে তৈরি এইসব ঠাণ্ডা পানীয়গুলি শরীরের কোন উপকারে লাগে না। ঠাণ্ডা পানীয়গুলির আসল উপকরণ কেউ জানে না, তবে বোতলের গায়ে যেসব কেমিকেলের নাম লেখা থাকে, তার সবগুলিই অপ্রয়োজনীয়। এগুলিতে কিছুটা খাওয়ার সোডা থাকার কারণে তা সামান্য অম্লনাশক হিসাবে কাজ করতে পারে, যদিও খাওয়ার সোডা অম্লনাশক হিসাবে খুব একটা ভালো নয়। এর আবার অন্য উপসর্গ তৈরি করার ক্ষমতাও আছে। বছর কয়েক আগে চিত্র-তারকা গোবিন্দা বেশি পরিমাণে ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ার জন্য হসপিটালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমাদের খাওয়া ঠাণ্ডা পানীয়গুলিতে দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আমাদের তৃপ্তি দেয়। বিজ্ঞাপনের মোড়কে মুড়ে সত্যি সত্যি কি 'গ্যাস' যে আমাদের খাওয়ানো হচ্ছে কে জানে!

* আমরা মেছো বাঙ্গালি, তাই মাছ তো আমরা খাবোই। তবে কিনা 'নতুন প্রযুক্তি' কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদিত যে মাছ এই বঙ্গদেশে

অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করা হয়, সেই 'প্রযুক্তি' সম্পর্কে ভাবা দরকার। নুতন প্রযুক্তির নামে মানুষের বর্জ্যকে কাঁচা শাক-সব্জির চাষের জমির সার হিসাবে ব্যবহার করে সব্জি চাষ করলে সেই সব্জির মধ্যে ভারী ধাতুগুলির (পারদ, সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি) পরিমাণ থাকছে আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। একই ভাবে মানুষের বর্জ্য মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পোনামাছ চাষ করা হচ্ছে। সরাসরি খাদ্য হওয়ার জন্য মাছের মধ্যে এদের পরিমাণ অনেক বেশিই হবে। এই ধরনের মাছ খেলে রোগ-জীবাণু সংক্রমণের কথা বাদ দিলেও বিষাক্ত এই ধাতুগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করার ফলে নুতন নুতন শারীরিক উপসর্গ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা যাক। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এভাবে চাষ করা পোনা মাছে (আমাদের কাছে বিখ্যাত 'বিলাসপুরী কাটা পোনা'তে) পাওয়া যায় Poly Chlorinated bipheny জাতের বিষ। প্রমাণিত হয়েছে — এই কেমিক্যাল পুরুষদের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা ও যৌন ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে। এটি আবার মায়ের শরীর থেকে সন্তানের শরীরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ভবিষ্যত সহজেই অনুমেয়।

✸ এ হতভাগা দেশে দুধের চেয়ে জল দামী। গ্রামের মানুষ শহর-বাজারে গিয়ে চকচকে বোতল ভর্তি জল কিনে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে — এ দৃশ্য বিরল নয়। হায় ডাব! প্রচারের অভাবে তার সমস্ত প্রতিভারই অপচয় হয়ে গেল। মিষ্টিতে বিষাক্ত কেমিকেল মেশায় বলে সরকার বাহাদুর তো পলিপ্যাকে মিষ্টি বিক্রি বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছেন। জলে কেমিকেল মেশায় বলে প্লাসটিক পাইপ বা গৃহস্থের জল রাখার প্লাসটিক জগও ক্ষতিকারক, তাহলে পলিপ্যাক বা বোতলভরা জল ঠিক থাকে তো? জলটিও 'বিশুদ্ধ' তো?

দিল্লীর সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারনমেন্টের এক রিপোর্ট কিন্তু বিখ্যাত ব্রান্ডের জলের বোতলগুলির অধিকাংশে ডি. ডি. টি. বা গামা এইচ সি -এর মতো মারাত্মক বিষাক্ত সব পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। কে কার কথা শোনে?

✸ রাস্তার ধারে সুন্দর করে সাজানো, সাইজ করে কেটে রাখা ফলগুলি, অথবা মিষ্টির দোকানের সুদৃশ্য সো-কেশের মধ্যে থরে থরে সাজিয়ে রাখা নানান ধরনের মিষ্টি — এরা আমাদের আকর্ষণ করতে পারে না বললে তা মিথ্যে বলা হবে। এইসব কাটা ফল আর দোকানে সাজিয়ে রাখা মিষ্টি — এসবে উড়ে আসা ধুলো-ময়লা তো যথেষ্ট পরিমাণে পড়ছেই। তাছাড়া এগুলি আমরা খাওয়ার আগে আরোও অনেকে খেয়ে যান। সেইসব ভদ্রমহোদয়গণ বমি, পায়খানা, ড্রেন

বা আস্তাকুড় থেকে উড়ে এসে এগুলিতে খেতে বসেন, আর হাতে-পায়ে-শুঁড়ে বয়ে আনেন নানান রোগজীবাণু। প্রতিটি পড়াশোনা শেখা লোক ছেলেবেলা থেকে পড়ে এসেছে আমাশয়, টাইফয়েড থেকে কলেরা — সবই জল বা খাদ্য বাহিত রোগ, অথচ আমরা কেউই তা মনে রাখি না।

✸ এবার দুধের কথা। দুধ কে দেয়? গোরু-মোষ। কি খেয়ে দুধ দেয়? ঘাস-খড়-খইল। দুধে গোয়ালা কি মেশায়? জল। — আজ্ঞে না, প্রতিটি উত্তরই ভুল। দুধ আজকাল শুধুমাত্র গোরু-মোষে দেয়না, মেসিনও দেয়। যেসব গোরু সত্যিকারের দুধ দেয়, তাদের অধিকাংশই ঘাস খায় কদাচিৎ, খায় মানুষের তৈরি করা খাদ্য। এইসব তৈরি করা পশুখাদ্য বা খাদ্য উপকরণগুলি বাজার থেকে গোরুর মালিক কিনে পরম আদরে তার গোরুকে খাওয়ায়। খাদ্য উপকরণগুলি কেমন? যেমন, ধানের কুঁড়োর সঙ্গে তেঁতুল-খোলার কুঁড়ো, নষ্ট ব্যাটারীর ভেতরের কালো কার্বনগুঁড়ো, কাপড় রং করার ও ঘরের মেঝে রং করার কালো রং, পোড়া মবিল, মাটি ইত্যাদি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে 'মেশিনে' তৈরি হচ্ছে খইল। সেই খইল খেয়ে গোরু দেয় দুধ! এরপর আবার গোরুর দুধের ওপর নানারকম কাজকর্ম করা হয়। প্রথম প্রথম দুধের সঙ্গে জল এবং একই সঙ্গে মেশান হত বাতাসা বা স্যাকারিন, আলু-পাউডার, চক পাউডার, এরারুটের মতো আপাত নিরীহ সব জিনিসপত্র। কিন্তু বিজ্ঞান এগোচ্ছে না? তাই আজকাল দুধে মেশানো হয় ইউরিয়া, অ্যালকোহল, অ্যাসিড এবং অন্যান্য কিছু 'প্রয়োজনীয়' রাসায়নিক পদার্থ। এছাড়া দুধ যাতে পচে না যায়, তার জন্য কষ্টিক সোডা (NaOH) এবং আরো কিছু রাসায়নিক সংরক্ষকও (Preservatives) দুধে মেশান হয়। এইসব কেমিকেল কে কতোটা মেশায় তার হদিস কেউ রাখে না। তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে এই ব্যাপারের সবচেয়ে আধুনিক ব্যবস্থা — সিন্থেটিক দুধ। দিল্লিতে এই দুধ উৎপাদনের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে, অবশ্য আমাদের রাজ্যে এইরকম কোন কারখানা এখনও ধরা পড়েনি। কমদামী কাপড় কাচা ডিটারজেন্ট পাউডারের সঙ্গে রিফাইন্ড তেল মিশিয়ে থকথকে মলম তৈরি করে এর সাথে অল্প পরিমাণে মোষের দুধ মেশানো হয়। এরপর এর সঙ্গে পরিমাণ মতো জল মেশালেই তৈরি হয়ে যাবে শিশুপেয় সম্পূর্ণ খাদ্য — দুধ। ল্যাকটোমিটারের মতো সেকেলে যন্ত্রে দুধের এসব আধুনিক ভেজাল ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারে কোন সহজলভ্য যন্ত্রপাতিও বাজারে পাওয়া যায় না।

এরপর দুধ থেকে ছানা উৎপাদনের কথা। না লেবুর রস নয়, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেড পাউডারও নয়, বাথরুম পরিস্কার করার মিউরিয়াটিক অ্যাসিড ফোটা

দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ছানা। আবার ছানা ছেঁকে নেওয়ার পর ছানার জল ফেলে দেওয়ার নিয়ম নেই — ওটাকে মেশান হয় দুধের সঙ্গে। ল্যাকটোমিটার যন্ত্রে দুধের মধ্যে ঘি -এর শতকরা হার (Fat%) বেশি দেখাতে ও দুধে মেশান অন্যান্য ক্ষারধর্মী ভেজালগুলি যাতে দুধ নষ্ট করে ফেলতে না পারে — তার জন্য এই ছানার জল খুবই প্রয়োজনীয়।

দুধ থেকে পাওয়া গেল ছানা। এরপর এই ছানা থেকে পাওয়া যাবে নানান রকমের 'ছানার মিষ্টি'। তবে ময়রার দোকানে মিষ্টি কখনও ফেলা যায় না। এক মিষ্টি বিক্রি না হয়ে পচে গেলে সেগুলিকে গুঁড়ো করে কিছু নুতন ছানার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় নুতন মিষ্টি। এভাবে চলতেই থাকে, তাই এক মিষ্টি পচে গিয়ে জন্ম দেয় নুতন মিষ্টির, রসগোল্লা চম্‌চম্ দানাদার মিষ্টি সিঙ্গাড়া — এরকম বিভিন্ন মিষ্টির বিভিন্ন ধরনের "মিষ্টি শৃঙ্খল" আছে। দুধ থেকে যেদিন ছানা তৈরি হয়েছিল, আর সেই দুধের ছানার মিষ্টি যেদিন আমাদের প্লেটে পড়ে — এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য কয়েক মাসেরও হতে পারে। অনেক দোকানে আবার সব মিষ্টিতে কৃত্রিম গন্ধ মেশানোর রেওয়াজ আছে। কিছু টাটকা মিষ্টির সঙ্গে রাখা পচা মিষ্টির পচা গন্ধ যাতে আলাদা করে বোঝা না যায় — তাই এই ব্যবস্থা। আর গোলাপভোগের মতো রঙিন মিষ্টির কেমিক্যাল রংগুলি নিয়ে নতুন কথা কিছু বলার নেই। এরপর বাকি থাকে ময়দাজাত মিষ্টিগুলি। প্রথমেই জিলিপির কথা। জিলিপির ময়দা নিদেন পক্ষে সাতদিন না পচলে তা থেকে ভালো জিলিপি হয় না। মিষ্টি দোকানগুলির ভেতরের ঘরের এক অন্ধকার কোণে খোলা পাত্রে রেখে ময়দাকে এভাবে পচানো হয়। সাতদিনের বাসি-পচা 'খাম' থেকে পোকা ছেঁকে ফেলে সেই 'খাম' লেই করে ভেজে চিনির রসে জারিয়ে তৈরি করা হয় মুচমুচে জিলিপি। আর হলদে জিলিপির জাতভাই লাল অমৃতি বা লবঙ্গলতার মতো মিষ্টিগুলিকে রঙিন করতে ব্যবহার করা হয় সেই একই ধরনের Industrial use-এর জন্য তৈরি রং — যার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে বা ছোট শহরগুলির মিষ্টির দোকান আর হোটেল প্রায়ই এক সঙ্গে বা পাশাপাশি থাকে। এই হোটেল ও মিষ্টি দোকানে যারা খাদ্যগুলি তৈরি ও পরিবেশন করে, ন্যূনতম স্বাস্থ্যজ্ঞানটুকুও তাদের মধ্যে নাই। কাপ-ডিস্-থালা ধুয়ে ধুয়ে অধিকাংশের হাতে হাজা, বড়-বড় নখের তলায় কালো ময়লা আর গায়ে দাদ-চুলকুনি। অতি সামান্য বেতনের এইসব কর্মচারীদের আবার একটা বড় অংশ শিশু শ্রমিক – এদের কাছে পরিচ্ছন্নতা আশা করা যায় কি ?

✷ শীতকালে নলেন গুড়ের পায়েস বা সন্দেশ খাওয়ার মজাই আলাদা। অবশ্য আজকাল সারা বছরই নলেন গুড়ের পাটলি পাওয়া যায় — তা থেকে সন্দেশ বা পায়েস বানালেই হোল! দারুণ ব্যাপার — তাই না? আখ গুড় বা তাল গুড় থেকে নলেন গুড় উৎপাদন করা অবশ্য খুবই সহজ। পরিমাণ মতো ফসফোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে প্রথমে গুড়ের কালচে রং সাদাটে করতে হবে। এরপর এর সাথে একটুখানি ফ্রিজে রাখা আসল খেজুর গুড় জলে গুলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমতো ময়দা মিশিয়ে থকথকে করে ছাঁচে ফেলে দিলেই নলেন গুড়ের পাটালি তৈরি!

✷ এবার জিবে জল ঝরানো প্রসঙ্গ। তেলেভাজা। তেলেভাজা তেলে তো ভাজা, কিন্তু কি জিনিস কি তেলে ভাজা তা কখনও দোকানে উঁকি মেরে দেখেছেন? তেলেভাজার তেল ও তেলেভাজা দুই-ই অমর। ভোজ্য তেলকে উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘকাল ফোটালে তাতে অনেক রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয় — যেগুলির প্রতিটিই স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রতিদিন বার বার ফোটানো তেল (চলতি কথায় পোড়া তেল) তাই তেলেভাজার সবচেয়ে বিষাক্ত অংশ।

বাজার থেকে সিকি দামে কেনা পচা আলুর পচে যাওয়া অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ সেদ্ধ করে তৈরি হয় চপ-সিঙ্গাড়ার আলু। এই আলুর অনেকটা অংশ থাকে অসিদ্ধ, কারণ আলুর পচা অংশের পাশের কিছু অংশকে কোনভাবেই সেদ্ধ করা যায় না। এই আলু থেকে তৈরি করা চপ-সিঙ্গাড়া প্রতিদিন দুবেলা ভেজে ভেজে কতদিন পরে বিক্রি না হলে তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘুগনির মশলা (লেই) করতে ব্যবহার করা যায় — এ নিয়ে একটা ভালো রিসার্চ পেপার তৈরি করা যায়। তেলেভাজার সঙ্গে পাওয়া 'ফ্রি' যে সস্‌টা আমরা চেটেপুটে খাই, তা হল পচা রসগোল্লার রসের সঙ্গে কিছু 'সস্' মিশিয়ে তৈরি করা। ঐ সসের বোতলটা একটু দেখবেন তো। অতি সস্তার এই 'সস্' কতোগুলি কেমিক্যালের মিশ্রণ মাত্র — টম্যাটো, লঙ্কা বা সয়াবীনের সঙ্গে এদের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। এই একই সস্ ব্যবহার করা হয় এগরোল তৈরি করতে। আর আধপোড়া বিড়ি কানে গুঁজে ফুচকাওয়ালা যখন মাঝে মাঝে গায়ের দাদ চুলকাতে চুলকাতে তার লম্বা, কালো নখ দিয়ে ফুচকার পেট ফুটো করে কয়েকদিনের বাসি হড়হড়ে আর টক আলুসেদ্ধ, ভিনিগার আর তেঁতুলগোলা জল দিয়ে ফুচকা বানায়, আর আমরা টপাটপ খাই, তখনই বোধহয় আমাদের স্বাস্থ্য-সচেতনা বা পরিচ্ছন্নতা-বোধের আসল রূপটি বেরিয়ে পড়ে।

✷ হাতে গড়া আটার রুটি বা মুড়ি এখন টিফিন হিসাবে অচল। সকালে পাউরুটির সঙ্গে 'জেলি' লাগিয়ে খাওয়া এখন অনেক বাড়ির প্রাত্যহিক অভ্যাস।

পেয়ারা, কমলালেবু ও অন্যান্য অনেক ফলের নামে বিক্রি হওয়া নানান কোম্পানীর লাল-হলুদ-কমলা-সবুজ — নানান রঙের এসব জেলিতে অবশ্য এইসব ফলের রস একফোঁটাও থাকে না — থকথকে আগারের সঙ্গে চিনি আর কৃত্রিম রঙ-গন্ধ মিশিয়েই কেবলমাত্র এই 'জেলি' তৈরি করা হয়। খেতে খুবই ভালো লাগে — তবে ফলের নামে কৃত্রিম রঙ-গন্ধ খেতে গিয়ে বিষ ভোজনের একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, এই আরকি!

* এবার ফলের প্রসঙ্গ। শুধুমাত্র উদ্ভিদ হরমোন এবং কিছু রাসায়নিকের ব্যবহারে ফলন বাড়ানো, বীজহীন ফল উৎপাদন বা কাঁচা ফলকে পাকানো নয়, আজকাল ফল সংরক্ষণ করার জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে নানান বিষাক্ত পদার্থ। যেমন ধরুন, আপেলের উপর দেওয়া মোমের পাতলা প্রলেপ বা ছত্রাক নাশক হিসাবে বোরিক পাউডার লাগানো নানান ফল। আপেল-কমলালেবুর মতো দামী ফলের কথা ছেড়েই দিলাম, আজকাল কলা চাষ করার সময় কলা ফুলেও বিষ স্প্রে করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিদ্যা কাজে লাগিয়ে পোকামাকড়, অন্য ফল বা সব্জির জিন কেটে নিয়ে এসে কোন ফলের জিনের সাথে জুড়ে দিয়ে উৎপাদন করা ফলের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বীজহীন ফল উৎপাদন বা অসময়ে, বেশি করে উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা নানান উদ্ভিদ হরমোন ও বিষের প্রভাব আমরা এড়াবো কিভাবে? সেজন্য ফলও খুব নির্বিষ জিনিস — এটা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। আর ফ্রুট স্টলের ফলের রস? — এতে নোংরা জল থেকে তৈরি করা বরফ বা কৃত্রিম রং-গন্ধ মেশানো চলছেই। তবে আমরা গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙলীরা দামী ফলের রস খেতে পারিনা বলে সস্তায় পেসাই করা আখের রস খাই। কিন্তু আমরা কজন জানি যে আখের রস বের করানোর আগের দিন বিকাল থেকে ছাল না ছাড়ানো আখ সব বস্তাবন্দী করে জলে ফেলে রাখা হয়? অবশ্যই লুকিয়ে। তবে প্রায় সব-সময়ই লোকচক্ষুর আড়ালে পচা ডোবা, খাল-বিল — এসব জায়গাতেই এগুলি ডোবানো থাকে। তারপর পরের দিন ছাল ছুলে পেষাই করে রস বের করে লেবু-নুন মিশিয়ে সফেন গ্লাস আমাদের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। জলে না ডোবালে এই আখ থেকে মাত্র ১/৩ অংশ রস পাওয়া যেত, অর্থাৎ তিন গ্লাসের জায়গায় এক গ্লাস রস হত। এই রস পান করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আমরা ভাবি, একটা স্বাস্থ্যকর পানীয়তো খাওয়া হল।

* বাজারে গিয়ে টাটকা-তাজা ফুলকপি, বেগুন, উচ্ছে, পটল, পালং, মুলো ইত্যাদি শাক-সব্জি কিনতে আমরা সবাই খুবই উৎসুক। পোকা লাগা বেগুন-উচ্ছে বা কালচে ফুলকপি আর কে-ই বা কিনতে চায়? এবার এগুলি নিয়ে একটু

আলোচনা করা যাক। পটল বা বেগুন খেতে প্রতিদিনই ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ মারার জন্য বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয় (যেমন Furadon)। পটল খেতে ছত্রাক-নাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় নানান বিষাক্ত রাসায়নিক (Carbamate group of chemicals)। উচ্ছে খেতে দেওয়া হয় মশা-তাড়ানো ধূপে ব্যবহার করা বিষের একই দলের বিষ (Synthetic Pyrithroids)। এছাড়াও ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঝিঙে, টমেটো — সব সব্জিতেই নানান ধরনের বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে। পোকা মাকড়গুলি ক্রমশ বিষ-প্রতিরোধী হয়ে পড়ার জন্য বিষের পরিমাণ বাড়ানোর ও আরো ক্ষমতাশালী (ক্ষতিকারক) বিষ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা চিরকাল থাকবে। এইসব বিষগুলি সবই আমাদের শরীরের পক্ষে দারুণ বিষাক্ত। বেশি ফসল উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মারাত্মক সব বিষ — অথচ সঠিক প্রয়োজনে সঠিক মাত্রায় সেগুলি ব্যবহার করতেও তাদের শেখানো হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক বিষ নির্বাচন করার ক্ষমতার অভাবে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে নানারকম বিষ ব্যবহার করা হচ্ছে — আর ব্যবহৃত বিষের মাত্রা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। অবস্থা এমনই, সরষে চাষের সিজনে, গ্রামাঞ্চলে যে মৌমাছি চাষ করে এত মধু উৎপাদন করা হচ্ছে — তার মধ্যে থাকা সম্ভাব্য কীটনাশকের ঘনত্বের কথা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়। এছাড়াও টকটকে সবুজ শাক-সব্জি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় প্রচুর রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার, বিশেষতঃ ইউরিয়া। প্রতিদিন শাক-সব্জির সাথে সাথে ইউরিয়া খাওয়া পাকস্থলীর ক্যানসার হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া এ থেকে শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (যেমন লিভার বা কিড্‌নির) মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও শরীরে এইভাবে ইউরিয়া দীর্ঘদিন প্রবেশ করে চললে শরীরের নানান বিপাকীয় কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গিয়ে অনেক মারাত্মক রোগের সূত্রপাত হতে পারে।

সব্জি উৎপাদনেই বিষের ব্যবহার শেষ হয়ে যায় না। বাজারে আসার আগে পটল সবুজ করতে তুঁতে গোলা জল, রাঙা আলু 'রাঙা' করতে এরিথ্রোসিন গোলা জল — নানান রকমের কৃত্রিম বিষাক্ত রংয়ের ব্যবহার চলছেই। যাবেন কোথায়?

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (W W F) নামের একটি সংস্থা ইউরোপের দেশগুলিতে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে মানুষের তৈরি করা ও ব্যবহার করা নানান বিষাক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক পদার্থ ইত্যাদি প্রায় ৭০ হাজার কেমিকেল জল, মাটি এবং বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। যথারীতি এরা ঢুকে গেছে আমাদের খাদ্য-শৃঙ্খলেও। এইসব রাসায়নিক-বিষের প্রভাবে

শিশুদের মস্তিষ্কের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নানান বিকৃতি আসার ফ
শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যহত হওয়া, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ক
যাওয়া, স্নায়বিক দুর্বলতা হওয়ার থেকে শুরু করে কম ওজনের শিশুর জন্ম হও
বা জন্মানোর পর ওজন সঠিকভাবে না বাড়া, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গে ক্যান্স
হওয়া — ইত্যাদি নানান মারাত্মক রোগের জন্ম হচ্ছে। এই দূষণ আক্রান্ত
থেকে সন্তানের মধ্যেও চলে যায়। এইসব বিষের প্রভাবে বড়দের শরীরেও নান
স্নায়ুরোগ-সহ অন্যান্য অনেক দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। স্বভাবতঃই এ
প্রভাব হবে সুদূর প্রসারী।

✸ এবার অন্য কিছু বিষ — ভেজাল বিষের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদে
অনেকের ধারণা ভোজ্য তেল, দুধ, মাখন বা গুঁড়ো মশলার মতো জিনিসপত্রে
কেবল ভেজাল থাকতে পারে। একদম ভুল ধারণা। সব কিছুর মতো ভেজ
মেশানোর পদ্ধতিতেও আধুনিকতা এসে গেছে, আর তাই ভেজাল মেশানো য
না এমন কোন খাদ্য উপকরণই আজ আর অবশিষ্ট নেই। পোকায় ঝাঁঝরা মট
ছোলা, অড়হর, খেসারী, মুগ, মুসুর এবং কিছু গম — এসব একসঙ্গে পেষাই হ
'বেসন' তৈরি হয়। পোকা, পোকার বাসা বা পোকাদের দানা দানা মল — স
এই বেসনের অঙ্গ হয়ে যায়। এরকম 'ভেজালের' কথাতো কল্পনাতেও মাথ
আসবে না, অথচ বাস্তবে এমনটাই ঘটছে। ক্রমাগত খেসারীর ডাল খে
পক্ষাঘাত রোগ (Lathyrism) হওয়ার কথা প্রমাণিত। এই বেসন দিয়ে তৈ
তেলেভাজা খেয়ে ঠিক কি কি রোগ হতে পারে তা কেউ বলতে পারবে কি

✸ তেল মশলায় ভেজাল মেশানো খুব সহজ। সর্ষের তেলের স
রেপসীড বা পাম তেল, শিয়ালকাঁটার তেল বা আর্গামোন তেল ছাড়াও মেশা
হয় মবিল। আসল সর্ষের তেলের থেকেও বেশি ঝাঁঝালো হল সর্ষের তেলে
সঙ্গে মেশানো কৃত্রিম কেমিক্যাল গন্ধটি। যেকোন সরষের তেলের মিলে গি
শিশি থেকে এই গন্ধটি একফোঁটা হাতে নিয়ে দু'হাতে ঘষে নেওয়ার পরও হ
দুটো নাকের কাছে আনা যায় না, এমনই তীব্র এর গন্ধ। শুধুমাত্র সর্ষের তেলে
কারখানা নয় — ভেজাল মেশানোর আরেকটি কেন্দ্র হল অন্য রাজ্য থেকে আ
সর্ষের তেল ভর্তি রেলের ট্যাঙ্কার থেকে তেল বের করে টিন বা প্যাকেটে ভ
করার কর্মক্ষেত্রটি। আমাদের রাজ্যে ব্যবহৃত সর্ষের তেলের অধিকাংশই এভাবে
টিন বা প্যাকেট ভর্তি করা হয় — টিনের উপর যাই লেখা থাক না কেন।
রাজ্যে ভেজাল রেপসীড খেয়ে মানুষ পঙ্গু হওয়ার উদাহরণ আছে (বেহালায়)
সেখানে তেলে কি কি ভেজাল কিভাবে মেশান হয় তা সহজেই অনুমেয়।

✱ গুঁড়ো লঙ্কা তৈরি করার সময় শুকনো লঙ্কার সঙ্গে ছত্রাক পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া লঙ্কা, বালি, মাটি, কাঠের গুঁড়ো, গায়ে মাখা পাউডার এবং কৃত্রিম লাল রং মিশিয়ে একসাথে গুঁড়ো করে প্যাকেট করা হয়। পোকাধরা মুগডাল ও নষ্ট হয়ে যাওয়া গোটা হলুদকে 'হলুদ' করতে বিষাক্ত মেটানিল ইয়োলো (Metanil Yellow) এবং লেড ক্রোমেট (Lead Chromate) মেশানো হয়। এই হলুদগুলির সঙ্গে হলুদ রঙে রাঙানো ময়দা ও ধুলো মিশিয়ে একসঙ্গে গুঁড়ো করে প্যাকেট বন্দী করা হয়। গমের সঙ্গে নরম পাথর, চকখড়ির গুঁড়ো ও কলিচুন মিশিয়ে গুঁড়ো করে আটা তৈরি করা হয়। ঘিয়ের সঙ্গে ডালডা (বনস্পতি) আর ডালডার সঙ্গে পশু চর্বি ও মোম মেশানো হয়। আগে ব্যবহৃত চায়ের পাতার সঙ্গে Ferrons Sulphate নামের এক লৌহঘটিত লবনের দ্রবণ মিশিয়ে চা পাতাকে 'তাজা' করা হত। এখন সস্তার 'চা পাতা' তৈরি হয় বিশেষভাবে তৈরি চামড়ার গুঁড়ো, কৃত্রিম রং আর গন্ধ মিশিয়ে। লোকাল ট্রেনে বা রাস্তার ধারের দোকানে যে 'চা' বিক্রি হয়, তার ব্যবহৃত 'পাতা'গুলিকে হাতে ঘসে দেখলে সহজেই সব বুঝতে পারবেন।

নেমন্তন্ন বাড়িতে খেতে গিয়ে শেষপাতে মিষ্টি দই না খেলে ঠিক তৃপ্তির ঢেকুরটা ওঠেনা। তবে এই তৃপ্তির ঢেকুরটা তোলার আগে ঐ দইয়ের সাজা যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ে এসে বাড়িতে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দই বসানোর চেষ্টা করুন তো! অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভেজাল দুধও নয় — স্রেফ ময়দা, তেতুল বিচির গুঁড়ো, বিস্কুট কারখানার বিস্কুট গুঁড়ো ইত্যাদি কিছু হাবিজাবি জিনিস কৃত্রিম রং-গন্ধ সহযোগে দুধ-পাউডারের নামে চল্লিশটাকা কিলোগ্রাম দরে কিনে জলে গুলিয়ে চিনি পোড়ান রং-এর সঙ্গে মিশিয়ে জমিয়ে 'দই' নামক সু-খাদ্য তৈরি হচ্ছে। দইয়ের উপরের লোভনীয় মোটা 'সর'টা? ওটা জল জমে যাওয়া ডালডা। লস্যি বা দই-বড়া তৈরি করতেও ব্যবহার করা হয় এইরকম 'দই'।

'সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য' কথাটি আজকাল তীর্যক অর্থে ব্যবহৃত হতে প্রায়ই শুনি। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য এমন খাদ্য খুব কমই পাওয়া যায় (অবশ্য পেঁপের মতো ফল বা ডিমের মতো আমিষ খাদ্যের কথা আলাদা)। তাই সস্তায় ভালো খাবার খুঁজতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র ভেজালদারদের উৎসাহই দিই। খাদ্যদ্রব্য রং ও গন্ধের গুণে আকর্ষক করার জন্য ও খাদ্য-উপকরণ বা খাদ্যদ্রব্যে নানান ভেজাল মেশানো হয়। আধুনিক জীবন-যাপনের উপযোগী করে তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের Fast food-এর উপকরণ, গুঁড়ো মশলার ব্যবহার — এসব শুধুই শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বিভিন্ন উপকরণ এবং ভেজাল মেশানোর নুতন নুতন রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে।

খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত বিষাক্ত কেমিকেলগুলি খুব কম কম করে প্রতিদিন শরীরে ঢোকে, সেজন্য তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ টের পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কেমিকেলগুলিকে নষ্ট করার দায়িত্ব লিভারের আর শরীর থেকে বের করার দায়িত্ব কিড্‌নির। এদের কর্মক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। এদের ওপর পড়া অত্যাধিক চাপ অনেক সময় এদেরকেই নষ্ট করে দিতে পারে। আর তাছাড়া কেমিকেলগুলির মধ্যে অনেকগুলি ধীরে ধীরে শরীরে জমা হতে থাকে আর আমাদের অজ্ঞাতসারে কাজ করে যায়। পরে এক সময় মারাত্মক কোন রোগের রূপ ধরে প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব কেমিকেল শিশু থেকে বয়স্ক ব্যক্তি — সবার পুষ্টির ব্যাঘাত করে, রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়ে দেয়, তাই রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ সহজেই ঘটে। আমরা এই ধরনের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি, কিন্তু অসুখের মূল কারণের দিকটা খেয়াল করি না। ভেজাল বিষের পরিমাণ যখন অনেক বেশি হয়ে গিয়ে অনেক মানুষকে অসুস্থ করে তোলে, কেবলমাত্র তখনই আমাদের নজর সাময়িকভাবে হলেও ব্যাপারটির দিকে পড়ে। কয়েক বছর আগের বেহালায় রেপসীড তেলের বিষক্রিয়ার ঘটনা অথবা বছর-চারেক আগের দিল্লীর ভেজাল সর্ষের তেলের খবর হয়তো আমরা সবাই এখনও ভুলে যাইনি। কিন্তু খাদ্যের সঙ্গে বিষ খেয়ে ও প্রতিদিন শরীরে তিলে তিলে সঞ্চিত সেই সব বিষের কারণে আমরা কতো রকম শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় ভুগছি — তার খবর আর কে রাখে?

অথ পানীয় কথা

"Water water everywhere, not a drop to drink."

আমাদের এই গ্রহের চারভাগের তিনভাগ ঢেকে রেখেছে জল, তবু পান করার উপযোগী জলটুকুও পৃথিবীর অনেক মানুষের অধরা। সমীক্ষায় প্রকাশ — পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ দূষিত জল পান করার ফলে বা পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না পাওয়ার কারণে নানান রোগে ভোগে। পৃথিবীতে যতো শিশু প্রতিদিন মারা যায়, তার প্রায় অর্ধেকের মৃত্যুর কারণ হল জল-বাহিত ও জল-সম্পর্কিত নানান রোগ। আমাদের দেশে পাঁচ বছর বয়সের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশি শিশুর প্রতিবছর মৃত্যু হয় জল-সংক্রান্ত নানান রোগে। বড়দের মধ্যেও জল-সংক্রান্ত নানান রোগে ভোগার কারণে প্রায় ২৩ কোটি কর্মদিবস প্রতিবছর নষ্ট হয়।

আমাদের দেশে বড় বড় সমস্যা যতগুলি আছে — সেগুলির সবকিছুর সঙ্গেই দেশের ঘন-জনবসতি ও বিস্ফোরণের আকারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। এদেশের জল-সমস্যাও এর বাইরে নয়। প্রাকৃতিক পদার্থ হিসাবে ভাবলে জল হল এক খুব ভালো দ্রাবক — ভালো-খারাপ প্রাকৃতিক প্রায় সব পদার্থই খুব সহজে জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। গ্রামের ডোবা-পুকুরের বা নদী-নালার জলই হোক বা শহরাঞ্চলের নলের মাধ্যমে পাঠানো জলই হোক অথবা দার্জিলিং-এর মতো শৈল-শহরগুলির পাহাড়ের লোকে জমিয়ে রাখা জলই হোক — অত্যধিক ঘন জন-বসতি ও সেই 'জন'-জাত দূষিত পদার্থগুলির কল্যাণে সব জায়গার জলই যখন-তখন জীবাণু-সংক্রমণে দূষিত হয়ে যেতে দেখা যায়। টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আন্ত্রিক, আমাশয়, কলেরার মতো মারত্মক সব রোগের জীবাণুগুলি কিন্তু মানুষের মল-মূত্র মিশ্রিত পানীয় জলের মাধ্যমেই ছড়ায়।

ভারতবর্ষে পানীয় জলের প্রধান উৎস হল নদী ও ভূ-গর্ভের সঞ্চিত জল,

তবে সব ধরনের জলের সঞ্চয় কিন্তু পূর্ণ হয় বৃষ্টির জল থেকে। এদেশে কেবলমাত্র বর্ষাকালেই বৃষ্টির জল মেলে, সেজন্য যেটুকু সঞ্চয় হওয়ার তা হয় এই সময়েই। মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে সারা বছর ধরে যা জল খরচ হয়, তা সবই আসে এই সঞ্চয় থেকেই। দীঘি বা পুকুরে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে বিভিন্ন প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা আজকাল অনেক কমে গেছে, অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সামাল দিতে কৃষি-শিল্প-বাসস্থানের প্রয়োজনে জলের প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার প্রতিদিন অতি দ্রুত হারে বাড়ছে। এর ফলে ভূ-গর্ভে যে হারে প্রাকৃতিক ভাবে জল সঞ্চিত হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হারে জল ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলিত হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনে বন-জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে, ভূমিক্ষয় হচ্ছে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পলিথিন নামের অবিনশ্বর পদার্থটি ক্রমশ জমে জমে খাল-বিল-নদী-নালা সহ ভূ-ত্বকের এক ব্যাপক অংশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, ফলে বৃষ্টির জলের ভূ-স্তর ভেদ করে নেমে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে মানুষের প্রয়োজনে লাগার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের মধ্যে জমা-খরচের হিসাবের এই গরমিলের জন্যই কিন্তু এই জলের মধ্যে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের মতো বিষগুলি মিশে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। মাটির তলায় যেখানে বালুস্তরের মধ্যে জল জমে থাকে, সেই জায়গার আশেপাশেই থাকে জলে অদ্রাব্য আর্সেনাস পাইরাইট। জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে যখন বাতাস সেই ফাঁকা জায়গা দখল করে, তখন বাতাসের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তা থেকেই উৎপন্ন হয় জলে দ্রাব্য আর্সেনাস অক্সাইড। চলতি কথায় এই আর্সেনাস অক্সাইডই হল জলে মিশে থাকা বিষ-আর্সেনিক। সেজন্য জলস্তর নেমে গিয়ে বাতাস সেই জায়গায় পৌঁছতে না পারলে জলে কখনোই আর্সেনিক মিশতে পারত না। আর ফ্লোরাইড বিষটি ভূ-স্তরের বিভিন্ন অংশে যেমন থাকে, তেমনি আবার নানান শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে শিল্পজাত বর্জ্য হিসাবে উৎপাদিত হয়েও প্রকৃতিতে জমা হয়ে চলে। সাধারণতঃ প্রকৃতিতে ফ্লোরাইড অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে, তবে কোন কোন স্থানের ভূ-প্রাকৃতিক গড়ণই এমন যে বৃষ্টিপাতের প্রভাবে এই ফ্লোরাইড ভূ-গর্ভস্থ জলে মিশে যায়। আমাদের রাজ্যের বীরভূম জেলা হল এরকম একটি উদাহরণ।

ভূ-স্তরের উপরিভাগের জল ও মাটি আমাদের বোকামির ফলে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ফসল ফলানো ও পোকা-মাকড় মারার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে নানান ধরনের কীটনাশক। এগুলির ব্যবহারে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উপকারী নানান কীট-পতঙ্গ-পাখি-জীবজন্তুও মারা পড়ছে। গত পাঁচ দশক ধরে

এইরকম বেহিসাবী ব্যবহারের ফলে ডি. ডি. টি. সহ নানান মারাত্মক কীটনাশক ছড়িয়ে পড়েছে জল আর মাটির মধ্যে। শোষিত বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে এগুলি অনেক সময়ই পৌঁছে যাচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ জল-স্তরেও। ডি.ডি.টি'র আবিষ্কারককে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সময় কেউ কল্পনাও করতে পারেননি এর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলির কথা। একবার কোন কারণে ব্যবহৃত হয়ে গেলেই এই বিষ প্রকৃতিতে অতি দীর্ঘ সময় থেকে যায় — নষ্ট হয় না। আস্তে আস্তে এটি ছড়িয়ে পড়ে জলে-স্থলে, গাছপালা-জীবজন্তু এবং মানুষের শরীরে। এরা ক্রমে ক্রমে জমে চলে শরীরের মধ্যে — জমেই চলে। একটা নির্দিষ্ট সীমা অবধি শরীরের দেহ-কোষে জমে গেলে এই বিষ কোষের ডি.এন.এ.-কে প্রভাবিত করে ক্যান্সার সহ নানান মারাত্মক রোগের সূচনা করতে পারে। শুধু ডি.ডি.টি. নয় — একই ধরনের ক্ষমতা আছে কৃষিতে ব্যবহৃত অধিকাংশ কীটনাশকেরই। এর পরে আছে কৃষিতে ব্যবহৃত নানান রাসায়নিক সার — যা শেষ-মেশ মেশে সেই জল আর মাটির সঙ্গেই।

দূষিত পদার্থের বাহক হিসাবে নদীগুলির ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ তা আমরা ভাবতে শিখিনি। যে কোন বড় নদী পর্বত থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর সমতলভূমিতে বয়ে চলার পথে এর জলের সঙ্গে যোগ হয় নদীতীরের শহরগুলির সমস্ত আবর্জনা। এছাড়া এই নদীগুলির উপনদী-শাখানদীগুলিও একই রকম আবর্জনা বয়ে নিয়ে এসে বড় নদীর জলে মেশায়। নদীর উচ্চ থেকে নিম্ন অববাহিকার শহরগুলি একের পর এক এই দূষিত জল নাগরিক প্রয়োজনে নদী থেকে টেনে নিয়ে যতোটা সম্ভব পরিস্কার করে ব্যবহার করে। আর তারপর নিজের শহরের সব দূষিত পদার্থ ও আবর্জনাসহ এই জল নদীতে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে চলতেই থাকে। শুধুমাত্র পূণ্যতোয়া গঙ্গাকেই বহন করতে হয় ১১৪টি ছোট-বড় শহরের সমস্ত আবর্জনা! দিন দিন যতই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, জনবসতি বেড়ে চলেছে, নগরায়ণ বেড়ে চলেছে — নদীর জলের দূষণও বেড়ে চলেছে।

মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে উৎপন্ন দূষিত পদার্থগুলি ছাড়াও নদী-জল দূষণের আরেকটি বড় কারণ হল হরেক কিসিমের শিল্পজাত বিষ। সাব শিল্পজাত বিষই সারা বছর ধরে ঢেলে দেওয়া হয় নদীতে — আর নদী পরিকল্পনা হওয়ার পর প্রায় সারাবছর ধরেই অধিকাংশ নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। সুতরাং নদীতে প্রতিদিন ঘন হয়ে জমতে থাকে এইসব বিষ। এরপর বর্ষার জলের ঢল নদীতে নামলে এই বিষ জলে গুলে গিয়ে

ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তারপর সমুদ্র যাত্রার পথে এগুলি আর কি কি করে তা কেউ জানে না — কারণ এসব নিয়ে চর্চা করার সময় আমাদের নেই।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের পুকুর-ডোবা-খাল-বিল-নদীর জল দূষিত হয়ে গেছে বিষ আর সারে — অথচ গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জলের পর্যাপ্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও গ্রামের অনেক কৃষক কৃষিজমির জলই অনেক সময় পান করত — একথা অনেক বয়স্ক মানুষই জানেন, যদিও আজকের দিনে তা আত্মহত্যা করার একটি পদ্ধতি বলে মনে করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এক-একটি গ্রামের আয়তন ও জন-ঘনত্ব এক একরকম — তবু গড়-পড়তা হিসাবে এই দেশের মোট গ্রামের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ গ্রামে আজও পানীয় জলের কোন নিরাপদ উৎস (ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলনের ব্যবস্থা) নেই। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ জল মাত্রেই পানীয় জল হিসাবে উপযুক্ত — এই ধারণাটিও সঠিক নয়। মাটির নিচের এই জল অত্যাধিক হারে উত্তোলিত হওয়ার কারণে অন্য নানারকম বিপদেরও উৎপত্তি হচ্ছে। ভূ-গর্ভের এই জলের সঙ্গে আর্সেনিক মিশে যাওয়ায় অনেক জায়গায় মানুষের কাছে এই জল হয়ে গেছে বিষ! অপুষ্টিতে ভোগা গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আর্সেনিক যুক্ত জল পান করার ফল হিসাবে নানান চর্মরোগ থেকে শুরু করে চামড়ার দুরারোগ্য ঘা ও ক্যান্সার হতে দেখা যাচ্ছে। সেজন্য কৃষির বা শিল্পের প্রয়োজনে ইচ্ছেমতো বে-হিসাবী ভাবে ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন করার পদ্ধতি আজ এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকার মডেল অনুসরণ করে আমাদের দেশের প্রতিটি বড়-মাঝারি-ছোট শহরেই উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ জলকে পানীয় জল হিসাবে অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করে বাকি অংশ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটি — পুরসভার ব্যবস্থাপনায় নল মাধ্যমে পাঠানো জলই হোক বা মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে নলকূপ বসিয়ে উত্তোলিত জলই হোক — সব ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলের মানুষ ভূ-গর্ভস্থ জলকে উত্তোলন করার পর পাম্প করে ট্যাঙ্কে ধরে রেখে স্নান করা — জামাকাপড় কাচা-ধোওয়া থেকে ঘর ধোওয়া-গাড়ি ধোওয়া — সব কাজেই ব্যবহার করছে। এসব কাজে ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনই নেই। একই ভাবে স্যানিটরী ল্যাট্রিনে ফ্লাস টানার ইউরোপীয় মডেল অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যাপক পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে। গ্রাম থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হওয়া অনেক ছোট শহরেই কিন্তু পুকুর-দীঘির

মতো জলাশয় ছিল। সেগুলি অনেক মানুষেরই স্নান করা থেকে জামাকাপড় কাচার মতো অনেক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারত। নগরায়ণের পরিকল্পনা করার সময় প্রয়োজন না বুঝে এগুলি ভরিয়ে ফেলা হয়েছে — আর তৈরি করা হয়েছে নানান মারাত্মক সব সমস্যার।

পাহাড় বা সমতলভূমির মতোই সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের কাছেও কিন্তু নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্তি নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। চেন্নাই শহরে গ্রীষ্মকালে গেলে এই সমস্যার স্বরূপ অতি সহজেই বোঝা যায়। মানুষ হাইড্রোজেন বোমা বা গ্রহান্তরে মহাকাশযান পাঠানোর প্রযুক্তি আবিষ্কার করে ফেলল — অথচ সমুদ্রের জলকে পরিশুদ্ধ করে সস্তায় পানীয় জল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারল না! যতো চাপ সবই তাই পড়েছে ভূ-গর্ভস্থ জলের ওপরে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ভূ-গর্ভস্থ জল কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভূ-গর্ভস্থ জলের চরিত্র বিভিন্ন রকম, আবার একই জায়গার ভূ-স্তরের বিভিন্ন গভীরতায় পাওয়া জলের চরিত্রের মধ্যেও অনেক সময় ব্যাপক ফারাক থাকে। ১৯৯৪ সালে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। কয়েকটি ঘন-বসতি পূর্ণ ও শিল্প-বহুল শহরের জল নিয়ে এনারা পরীক্ষা করেছিলেন — মুম্বাইয়ের কাছে চেম্বুর, তামিলনাড়ুর মানালি, অন্ধ্রপ্রদেশের পাতনচেরু, গুজরাটের বাপী, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, মধ্যপ্রদেশের কোবরা এবং রাজধানী দিল্লী থেকে ভূ-গর্ভস্থ জল নিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফলে প্রকাশ পেল যে প্রতিটি জায়গাতেই ভূ-গর্ভস্থ জলে কৃষিজমিতে ব্যবহৃত নানা ধরনের বিষ এবং নানান শিল্পজাত বিষাক্ত কেমিকেল মিশে আছে। এই পরীক্ষায় আমাদের রাজ্যের হাওড়া শহরের জলে অন্যান্য দূষিত পদার্থের সঙ্গে ডি.ডি.টি. সহ কয়েক ধরনের কীটনাশক বিষ মারাত্মক মাত্রায় উপস্থিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পানীয় জলের সঙ্গে জুড়ে থাকা সমস্যাগুলি তৈরি করেছে ভারতবর্ষে জীবাণুমুক্ত, দূষণমুক্ত পানীয় জলের অ-সহজলভ্যতার এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত। এতো বড় একটি পরিপ্রেক্ষিত ব্যবসায়ীদের নজর এড়িয়ে যাবে — তা হয় না। সুতরাং স্বচ্ছল মানুষদের জন্য আকর্ষণীয় পানীয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা করা — এক অতি আকর্ষণীয় ব্যবসা। এদেশীয় ছোট-খাট কয়েকটি কোম্পানী সোডা-ওয়াটার বাজারে এনে এই ধরনের ব্যবসা শুরু করেছিল। অবশ্য দেশীয় কোম্পানীর ছোট-খাট সব পানীয়কে ছাপিয়ে দিয়ে এখন তো চলছে পেপসি

কোলার যুগ। তাছাড়া পানীয় জল নিয়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজারে এখন বোধহয় শ'খানেক ব্র্যান্ডের পানীয় জলের বোতল ও প্যাকেট পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের ঘোর লাগিয়ে শহরের মানুষকে প্রথমে ধরানো হয়েছিল ঠাণ্ডা পানীয়ের নেশা। এরপর ব্যাপক প্রচারের ফলে এখন গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই এগুলি সব মানুষের হাতের কাছে পাওয়ার বন্দোবস্ত সেরে ফেলা হয়েছে। গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে কি এ দেশে কোন ব্যবসা বলে? বোতল ভরা পানীয় জল বা কৃত্রিম ঠাণ্ডা পানীয় পান করার আগে আমাদের কারোরই একটা কথা খেয়ালে থাকে না — ভারতবর্ষের ভূ-গর্ভস্থ জলও যদি বিষাক্ত হয়ে যায় (যা প্রচার করা হয়) — তাহলে এইসব 'বিখ্যাত' ব্র্যান্ডের বিখ্যাত পানীয়গুলিতে ব্যবহৃত জল আসে কোথা থেকে? আমেরিকা-ইউরোপ থেকে এরোপ্লেনে বা জাহাজে করে নিশ্চয়ই নয়! মিনারেল ওয়াটার বা ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করার জন্য শহরাঞ্চলের আশে-পাশে যেসব কারখানা বসানো হয়, সেখানে গভীর নলকূপের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল তোলা হয় — সেজন্য এই জলে বিষ মিশে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে কোনো পানীয় কোম্পানীই কিন্তু এই জলকে বোতল ভর্তি করার আগে বিষমুক্ত করার জন্য উপযুক্ত দামী যন্ত্রপাতি বসানোর কথা ভাবে না। (ইউরোপ-আমেরিকায় যা করা বাধ্যতামূলক!) আমাদের এই জনাকীর্ণ গরীব দেশের মানুষের জীবনের দাম হয়তো অন্য মাপকাঠিতে মাপা হয়! অথচ কোম্পানীগুলির প্রচারের এমনই প্রভাব — দক্ষিণবঙ্গের ডাব ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে ঠাণ্ডা পানীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। ঠাণ্ডা পানীয়গুলিতে ঠিক কোন কোন কেমিকেল কতোটা মেশানো হয় — তার সম্পূর্ণ তালিকা কোন কোম্পানী প্রকাশ করে না — ব্যবসায়িক গোপনতার কারণে। অথচ ছোট-বড়, কম দামী-দামী, খাওয়ার-মাখার সব রকমের ঔষধ বাজারে আসার আগে তাদের সম্পূর্ণ ফর্মুলা জানানো বাধ্যতামূলক — তাও মানুষের শরীরের ওপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা না গেলে সেগুলিকে বাজারে আনার অনুমতি দেওয়া হয় না। খাদ্য-পানীয়তে ভেজাল রোধ করার জন্য প্রচলিত আইনগুলিতেও ঠাণ্ডা পানীয় বা বোতলবন্দী জলে কীটনাশক থাকার ব্যাপারে কোন বিধান নেই! তাই কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঠাণ্ডা পানীয়গুলির উপর কোন আইনী চাপ না থাকায় বিভিন্ন কোম্পানী ইচ্ছেমতো কেমিকেল মিশেয়ে ঠাণ্ডা-পানীয় তৈরি করে বাজার-জাত করছে। ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যবহৃত কেমিকেলগুলি পানীয়ের মধ্যে ভাসিয়ে (Suspended) রাখার জন্য যে কেমিকেলগুলি ব্যবহার করা হয় — সর্বাধিক সতর্কতা নেওয়া হয় সেগুলির নাম প্রকাশ করার ব্যাপারে। তাই কোন ঠাণ্ডা

পানীয়ে ব্যবহৃত কোন কেমিকেল আমাদের শরীরের কোন মারাত্মক ক্ষতি করে — তা সঠিক ভাবে জানার কোনো উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে অধুনা লুপ্ত একটি ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যবহৃত "Brominated Vegetable Oil" প্রসঙ্গটি কারো কারো স্মৃতিতে থাকতে পারে।

বোতল আর প্যাকেটবন্দী ঠাণ্ডা পানীয় ও 'মিনারেল ওয়াটার' নিয়ে কিছুকাল আগে বেশ হইচই হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করা যাক। দিল্লীর সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারনমেন্ট (C.S.E.) নামের সংস্থাটি তাদের দূষণ নির্ণায়ক ল্যাবরেটরীতে অত্যাধুনিক গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ক্যাপিলারী কলম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বাজার চলতি কোকা-কোলা ও পেপসি কোম্পানীর পরীক্ষিত মোট ১২টি পানীয়ের মধ্যে থাকা কীটনাশক বিষগুলির পরিমাণের মধ্যে খুব একটা ইতর-বিশেষ নেই! পেপসি কোম্পানীর পানীয়গুলির মধ্যে এই ধরনের বিষগুলির গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি লিটারে ০.০১৮০ মিলিগ্রাম এবং কোকাকোলা কোম্পানীর পানীয়গুলির মধ্যে এই ঘনত্ব ছিল প্রতি লিটারে ০.০১৫০ মিলিগ্রাম। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতে এই ধরনের বিষগুলির উপস্থিতি ঠাণ্ডা পানীয়গুলিতে সর্বোচ্চ লিটার প্রতি ০.০০০৫ মিলিগ্রাম অবধি মেনে নেওয়া যেতে পারে। সেই হিসাবে পেপসি কোম্পানীর পানীয়ের মধ্যে এই সর্বোচ্চ সীমার ৩৬ গুণ এবং কোকা-কোলা কোম্পানীর পানীয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সীমার ৩০ গুণ বিষ আছে! ঠাণ্ডা পানীয়গুলির মধ্যে মিরিন্ডা-লেমন ব্র্যান্ডে সবচেয়ে বেশি বিষ পাওয়া গেছে। এরপর কোকা-কোলা, পেপসি, ফান্টা, অরেঞ্জ, সেভেন-আপ, ব্লু-পেপসি, মাউন্টেন ডিউ, লিমকা, থাম্পস্-আপ, ডায়েট পেপসি ও স্প্রাইট। খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পেপসি ও কোকাকোলার যে ব্র্যান্ডগুলি বিক্রি হয়, সেগুলি নিয়ে এসে একই সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছিল। রিপোর্ট শুন-যবেন? এগুলির কোনটির মধ্যেই এই ধরনের কোনো বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি!

বোতল বা প্যাকেটবন্দী করে বিক্রি করা 'মিনারেল ওয়াটার'গুলিও একই সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছিল। মোট ১৭টি ব্র্যান্ডের জল পরীক্ষা করে এর মধ্যে নানান ধরনের কীটনাশক বিষের মিশ্রণ যা পাওয়া গেছে, তার গড় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্ণিত সর্বোচ্চ সীমার ৩৬.৪ গুণ! যে ব্র্যান্ডগুলি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, সেগুলি হল — অ্যাকুয়াপ্লাস, নং-১ ম্যাকডাওয়েল, বিসলেরি, ভোলগা, কিং-ফিসার, নেচ-আর, হেলো, বেইলি, পরস, কিনলে, পিত্তর লাইফ, প্রাইম, মিন্‌স্ কট, অ্যাকুয়াফিনা, ক্যাচ, হিমালয়া এবং বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানি করা 'ইভিয়ন'। সমস্ত ব্র্যান্ডের জলেই কীটনাশক অর্গানো ফসফরাস ও

অর্গানোক্লোরিন জাতীয় বিষ পাওয়া গেল, বিদেশ থেকে আমদানী করা পানীয় 'ইভিয়ন' তে কিন্তু কোন বিষেরই হদিস মিলল না!

মিনারেল ওয়াটার ও ঠাণ্ডা পানীয়ে হদিস পাওয়া কীটনাশক-বিষগুলি আমাদের শরীরে প্রধান কি কি ক্ষতি করে — তা সারণীতে দেখানো হল। ঠাণ্ডা পানীয়ের মধ্যে থাকা কীটনাশক বিষগুলি যা ক্ষতি করে, করেই। আর বাকি থাকে আমাদের অজানা কেমিকেলগুলি, যেগুলি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এর পরে থাকে আমাদের জানা কেমিকেলগুলি — যেগুলি ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে থাকে বলে আমরা জানি। প্রতিটি ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে মিষ্টি (Sugar) মেশানো থাকে। তবে ডাক্তারী পরিভাষায় এই 'মিষ্টি' আমাদের বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে থাকা 'মিষ্টির' থেকে আলাদা। আমরা 'মিষ্টির' সাথে সাথে অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপকরণও পাই, আর ঠাণ্ডা পানীয়গুলিতে এগুলির একটিও থাকে না। এছাড়া ঠাণ্ডা পানীয়তে ব্যবহৃত 'মিষ্টি'গুলি Sucrose দলের নয়, যা আমাদের শরীর সহজে ব্যবহার করতে পারে। এগুলি Fructose দলের, যা শরীরে এমন সব বিপাকীয় পরিবর্তন ডেকে আনে যাতে শরীরে অত্যাধিক মেদ জমা হওয়ার রাস্তা প্রশস্থ হয়। তাছাড়া অত্যধিক পরিমাণে এই ধরনের 'মিষ্টি' সুস্থ মানুষকে Blood Sugar-এর রোগীতে পরিণত করতে পারে।

ঠাণ্ডা পানীয় খেলে দাঁতের অত্যধিক ক্ষয় হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাই এর প্রভাব অনেক বেশি হতে পারে। এছাড়া ঠাণ্ডা পানীয়ের মধ্যে থাকা ক্যাফিন (Caffiene) নামক পদার্থটি বাচ্চাদের শরীরে গিয়ে নানান উপসর্গ তৈরি করতে পারে। ঠাণ্ডা পানীয়ে থাকা ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene Glycol) এবং নানান কৃত্রিম রং ও গন্ধ — এগুলির প্রত্যেকটিই আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয়ে গেল হইচই! যথারীতি ঠাণ্ডা পানীয় কোম্পানীগুলি কোর্ট-কাচারী করল। মহামান্য কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিলেন এই ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। সরকারী ল্যাবরেটরীগুলিতে যথারীতি ঠাণ্ডা পানীয়গুলি আবার পরীক্ষা করা হল। এসব পরীক্ষায় অবশ্য তেমন মারাত্মক কিছু পাওয়া গেল না। সরকারী পরীক্ষায় যে ঘনত্বের বিষের হদিস পাওয়া গেল, তা ইউরোপ-আমেরিকার হিসাবে মারাত্মক হলেও ভারতীয় হিসাবে তাকে 'বিষ' বলে ভাবার কোন কারণ নাই।

মিনারেল ওয়াটার এবং ঠাণ্ডা পানীয়ে থাকা কীটনাশক এবং মানব শরীরের উপর সেগুলির প্রভাব

বিষের নাম	মানুষের শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া
১। লিনডেন (Lindane)	ক্যানসার তৈরি করা; শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করে দেওয়া, শরীরের স্বাভাবিক হর্মোন নিঃসরণ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনা ইত্যাদি।
২। ডি.ডি.টি. এবং তার 'সন্তান-সন্ততি'রা (D.D.T. and it's metabolites)	বিভিন্ন প্রজনন-অঙ্গের ক্ষতি করা, হাড়ের গঠন নরম ও ভঙ্গুর করা, মেয়েদের স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনা তৈরি করা ইত্যাদি।
৩। ম্যালাথিয়ন (Malathion)	স্নায়ুর বিষ হিসাবে কাজ করে মস্তিষ্ক-সহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে মারাত্মক গলযোগ ডেকে আনা; বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেওয়া ইত্যাদি।
৪। ক্লোরপাইরিফস (Chlorpyrifos)	শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি করা; গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করা ইত্যাদি।

অপুষ্টির ইতিকথা

অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা বাঙালির জাতীয় ধর্ম। অম্বল, আমাশয় আর গ্যাস বাঙালির জীবনসঙ্গী। বাঙালির সুখাদ্য-কুখাদ্য বিষয়ে জ্ঞান গবেষণার বিষয়। যশোহরের কইমাছের কথা কেবল শুনেছি, তবে আমরাও তো এক অর্থে যশোরের কইমাছ। আমাদের মাথার সাইজ তথা মস্তিষ্কের গড়ণ বেশ বড়। (যদিও এই 'উন্নত মস্তিষ্কে'র প্রয়োগ পারস্পরিক ঈর্ষা থেকে খুব নীচুস্তরের রাজনীতি — এই সীমার মধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে)। আর শরীর? গ্রাম-বাংলার হাড়-জিরজিরে মানুষজনই হোক বা শহুরে খেঁখুরে অম্লরোগী বা পেটমোটা গালফোলা প্রসাধনী প্রলেপে চকচকে মানুষজনই হোক, সুস্থ শরীরের মানুষ খুবই কম। রোগা-মোটা দুই ধরনের মানুষের কারোরই পুষ্টি সঠিকভাবে হয়নি। এরা সবাই অপুষ্টিতে বা অপপুষ্টিতে ভোগেন।

গ্রামবাংলায় দুই ধরনের গরীব মানুষ দেখা যায়। প্রথম ধরনের মানুষকে কবির ভাষায় "হাড়-হাভাতের দল" বলা চলে। এরা এখনও শহুরে হয়ে ওঠেনি, অথবা বলা ভাল, হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যাখাদ্য নিয়ে তেমন কোন বাছবিচার এদের নেই। দুবেলা দুমুঠো খাদ্যও এদের অনেক সময় জোটেনা, তবে তার প্রধান কারণ প্রতিটি গ্রামে থাকা গড়ে পাঁচটি করে দেশি মদের দোকান আর তাস জুয়া, লুডো জুয়া থেকে শুরু করে গ্রামের মেলায় চলা চক্র-জুয়া বা লটারী-জুয়ার মতো ব্যাপারগুলি। সংসারের সদস্য সংখ্যা অনেক, চারিদিকে অভাব, তবুও এদের মধ্যে অপুষ্টি তত ব্যাপক নয়। এর কারণ হল গেঁড়ি-গুগলি, শামুক-ঝিনুক, কেঁচো-মাছ থেকে থানকুনি, শুসনি, কলমি, শালুক, হেলঞ্চ — এসব বিনে পয়সার খাদ্য খাওয়া। এছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে দৈহিক শ্রম করতে হয়, কাজেই শরীর শক্তপোক্ত হতে বাধ্য। তবে এই শ্রেণির মানুষজনের নুতন প্রজন্ম খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক সব ব্যাপারে বাবু-বিবিদের নকল করতে গিয়ে ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারার হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরে আরেক রকমের গরীব মানুষ গ্রামে দেখা যায়, তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এদের সামান্য চাষজমি আছে, যা থেকে রোজগার

হয় অতি সামান্য। অথচ দায় দায়িত্ব, আতিথেয়তা, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখা — এসব ঠিক-ঠাক পরিচালনা করার চেষ্টা করতে গিয়ে এনাদের নানান ভড়ং দেখাতে হয়। আলুভাতে ভাত খোর এই শ্রেণির বাঙালী আবার 'ছোটলোকদের' মতো গ্রামীণ শাক-সব্জি বা গেঁড়ি-গুগলি খাওয়াকে ঘেন্না করেন, অথচ অর্থাভাবে বাজার চলতি পুষ্টিকর খাদ্য কিনে খাওয়ার সামর্থও এনাদের নেই। পেঁপে, লাউ-কুমড়া, কচু, ওল, কুদরি বা শিমের মতো সহজে চাষ করার উপযোগী সব্জি চাষেও এনাদের অনীহা — কারণ বাড়ির কেউ এসব সব্জি খান না। দূরদর্শনের দৌলতে বাড়ির ছেলেমেয়েদের নুডল থেকে চাউমিন আর সিময় থেকে ভুট্টাগুঁড়ো ফ্লেক ছাড়া চলে না। এছাড়া 'মেলাঘাটের' খাদ্য হিসাবে বা আত্মীয়তা রক্ষা করা ও অতিথি-সৎকার করার জন্য সাত-বাসী ঘুগনী-তেলে ভাজা বা চৌদ্দ-বাসী মিষ্টির মতো 'ভালমন্দ' খাওয়া-দাওয়া তো মাঝে মধ্যে আছেই। এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের আবার 'ছোটলোক'দের মতো শারীরিক শ্রমে চরম অনীহা। নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এই ধরনের গ্রামবাসী লোকজনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপুষ্টি দেখা যায়।

শুধুমাত্র অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ফলেই নয়, যেকোন ধরনের সুখাদ্য নিয়ে অসময়ে আহারে বসলে তা শরীরের কোন প্রয়োজনে তো লাগেই না, উপরন্তু নানান রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সকাল থেকে বেলা দুটো-তিনটে অবধি খালিপেটে থাকার পর পেট ভরে আহার করলে তা মারাত্মক হতে পারে। আমাদের গ্রামবাংলার মায়েরা কাজের চাপে দিনের পর দিন ঠিক এই জিনিসটাই করেন। তাছাড়া সকালে খালি পেটে এককাপ চা খাওয়াটাকেই অনেকে সকালের খাওয়া বলে মনে করেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে চল্লিশ টাকা কিলোগ্রাম দরের যে চা কেনা হয়, সেটিও আরেক আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রতিদিন নির্দিষ্ট এবং উপযুক্ত সময়ে খাওয়া-দাওয়া করলে ডাল-ভাত খেয়েও সুস্থ থাকা যায়, আর অসময়ের পোলাও-কালিয়া ভোজন হয়ে যায় বিষ-ভক্ষণ। কি কি খাদ্য খাওয়া যেতে পারে? গ্রামের মানুষ হাতের কাছে যেসব খাদ্য পান তা সবই খেতে পারেন। অনাবশ্যক শহুরে মানুষদের নকল করে বাজার থেকে দামী দামী খাবার কিনে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। গ্রাম্য শাক-সব্জি, গ্রামে সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন ফল, খাল-বিল-পুকুর-ডোবা থেকে পাওয়া চ্যাং, ল্যাটা, কেঁচো মাছ এবং নানান ধরনের ছোট মাছ বা শামুক-ঝিনুক — এসব খাওয়া অভ্যেস করতে পারলে অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা অনেক কমে য়াবে। গ্রামে কচু, মানকচু, ওল, পেঁপে — এসব গাছের বীজ পোড়ো ফেলে রাখা জমিতে একবার পুঁতে দিলেই হল — কোন যত্ন ছাড়াই এরা সব সময় খাবারের যোগান দিতে পারে।

'আধুনিক' হতে গিয়ে গ্রাম্য মানুষজনও এগুলিকে 'অখাদ্য' মনে করছেন। এই একই কারণে পুঁইশাক, লাউশাক, কলমি, হেলঞ্চ এসব এমনি এমনি বা অল্প চেষ্টায় জন্মানো শাক-সব্জি ছেড়ে সার-বিষ দিয়ে চাষ করা পালং বা হাইব্রিড কলমি কিনেতে গ্রামের মানুষও বাজারে ছুটছে। অভাবটা কি শুধু টাকা পয়সার, না বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের — এ কথাটি ভেবে দেখতে হবে। শহর বা গ্রামে — যেখানেই হোক জোটানো খাদ্য যেমনটাই হোক না কেন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সুসিদ্ধ করা খাবার গরম গরম অবস্থায় খেতে হবে। খেতে বসার আগে খাওয়ার পাত্র অতি অবশ্যই পরিস্কার জলে (গ্রামাঞ্চলে নলকূপের জলে) ধুতে হবে এবং সাবান ও জল দিয়ে খাদ্য পরিবেশক ও ভোজনকারী — উভয়েরই ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। কখনই পেট পুরোপুরি ভর্তি করে খাওয়া উচিৎ নয়। গুরুভোজন করাটা কোন কাজের কথা নয়। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে এঁটো-কাঁটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা দরকার। দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম অবশ্যই নেওয়া দরকার।

আমাশয়, টাইফয়েড, জনডিস থেকে আন্ত্রিকের মতো মারাত্মক রোগগুলি সবই জল ও খাদ্য বাহিত রোগ। গ্রামাঞ্চলে নলকূপের জল ছাড়া পরিস্কার পানীয় জলের উৎস খুব বেশি নাই। অবশ্য নলকূপ মানে মাটির ১৫-২০ ফুট নীচের কোন জায়গা থেকে জল তোলা নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার ভূ-প্রাকতিক গড়ণ বিভিন্ন রকম। তবু উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলাতেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এইরকম ২০ ফুট পাইপ দিয়ে নলকূপ তৈরি করা যায়। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে এরকমটাতো হামেশাই দেখা যায়। এসব 'নলকুপের' জলও পানের যোগ্য নয়। অন্ততঃ ২০০ ফুট গভীর না হলে সেই নলকূপের জল পানযোগ্য হয় না। খাওয়ার পর মুখ ধোয়া বা সকালে দাঁত মাজার পর মুখ ধোয়া — এগুলোও নলকূপের জলে করতে হবে। অথচ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ একই পুকুর ও ডোবার জলে মুখ ধোয়া, স্নান করা, কাপড়-চোপড় কাচা, বাসনমাজা, গবাদি পশুকে ডুবিয়ে স্নান করানো — এসব কাজ করেন। অধিকাংশ বাড়িতে রান্নাও করা হয় এই জলেই। অথচ এইসব জলের উৎসগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সবার অনীহা। শরিকী বিবাদই হোক বা আলসেমি অথবা অজ্ঞানতাই হোক, কচুরিপানা-টোকাপানা ভরা পুকুরের জল অথবা পুকুরপাড়ের আস্তাকুড়ের পচা গোবর মেশা বা পুকুরপাড়ের গাছের পাতা পড়ে পচে যাওয়া নীলাভ-সবুজ রঙের জল — এসবই মারাত্মক। বর্ষাকালে চাষের জমির দূষিত জল এসব পুকুরে ঢোকে। এছাড়াও অনেকের

আবার বাড়ির পুকুর পাড়েই খাটা-পায়খানা — কাজেই বর্ষার সময় সেখান থেকে আসা জলও মেশে পুকুরের জলে। এই জল খানিকটা হলেও পরিস্কার করা যায় পুকুরে থাকা মাছেদের কোন ক্ষতি না করেও। পানা পরিস্কার করা, মাঝে মধ্যে চুন ব্যবহার করা, পুকুর পাড়ের গাছপালা কেটে পরিস্কার করা, যেকোন ধরনের নোংরা জল পুকুরের জলে মেশার সুযোগ বন্ধ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা সহজেই নেওয়া যায়।

অনেক সময় আবার সামান্য অজ্ঞানতা থেকে অনেক অসামান্য অসুখ বিসুখের আমদানি হয় মানুষের শরীরে। যেমন গ্রামাঞ্চলের জল বহন করার মাটির বা পেতলের ঘড়া বা কলসি। এগুলি পুকুরের জলে ধুয়ে নলকূপের জল ভরলে ভালো জলের সঙ্গে খারাপ জল মিশে যায়। আবার দীর্ঘকাল ধরে বাড়িতে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া এরকম কলসিতে বাহির থেকে জল এনে ভরে রাখা হয়, কলসিটিকে পরিস্কার করা হয় না। এগুলিও জলদূষণের কারণ হতে পারে। তবে জলদূষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল কলসির মধ্যে গ্লাস বা এই ধরণের কোন পাত্র ডুবিয়ে সব সময় জল নেওয়া। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেন না প্রতিবার মাটির উপর রাখা গ্লাসের গায়ে-তলায় লেগে থাকা নোংরাগুলি পানীয় জলের সাথে মিশতে থাকে। এই জল পান করা মারাত্মক হতে পারে।

খাদ্য-পানীয় ছাড়াও নানান রকম অসুখে ভোগাও মানুষের অপুষ্টির এক অন্যতম কারণ। নখ কাটা-সাবান মাখা বা খেতে বসার আগে ও মলত্যাগ করার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার কারণে যেমন অনেক রোগে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভোগেন, তেমনি নোংরা দূষিত জলে স্নান করাও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেরই অনেক চর্মরোগের কারণ। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের মায়েদের অধিকাংশের স্বাস্থ্য এতো খারাপ হওয়ার পেছনে এতো অসুখ-বিসুখে ভোগাও একটি বড় কারণ। রোগে ভোগা অপুষ্ট, দুর্বল শরীরে সীমার বাইরে পরিশ্রম করতে গিয়েও নানান বিপত্তি হয়। রক্তহীন ও নিম্ন রক্তচাপের অপুষ্ট শরীরে বছর বছর সন্তান প্রসব করা, সন্তান প্রসবের পর উপযুক্ত বিশ্রাম ও চিকিৎসা না পাওয়া ইত্যাদি কারণে গ্রামাঞ্চলে বহু মহিলারই জরায়ু ও সংলগ্ন অঙ্গের বাহিরে বেরিয়ে আসা রোগ হয় (Prolapse)। শারীরিক গঠনগত কারণে নোংরা-পচা পুকুর-ডোবার জলে স্নান করা, শৌচকর্মাদি করা এবং নানান অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস থাকার দরুণ সাদা-স্রাব ও অন্যান্য অনেক স্ত্রীরোগের মতো এই রোগেরও বৃদ্ধি ঘটে, অথচ লজ্জাবশতঃ মায়েরা এই রোগ গোপন করার কারণে অধিকাংশ রোগীই একসময় মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে যান। রোগ যন্ত্রণা অসহ্য

হলে তবেই ডাক্তার দেখানোর কথা মাথায় আসে, তাও হাফ-হাতুড়ে, হাতুড়ে এসব পেরিয়ে তবে তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া!

গ্রামবাংলায় বসবাসকারী কিছু মানুষ যেমন প্রায়-শহুরে জীবনযাপন করেন তেমনি শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাস করা মানুষগুলির জীবনযাত্রার মান অনেকসময় দেশের সবচেয়ে দূষিত গ্রামটির থেকেও খারাপ হতে দেখা যায়। সেজন্য নিজেদের 'শহুরে' মনে করে শহরবাসীদের উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। গ্রামাঞ্চলের পুকুর-ডোবার জল খুব খারাপ, কিন্তু আমাদের দেশের শহরগুলির নলবাহিত জল খুব ভালো — এই ধারণাটির সপক্ষে পুঁথিগত যুক্তি আছে অনেক, তবে বাস্তব অবস্থা অন্য কথা বলে। আমাদের দেশের জলের পাইপ-লাইন বসানোর ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেগুলি দেখভাল করার মানুষও খুব কম — আর অনেক ক্ষেত্রে এসবের কোন দেখভাল করাই হয় না। তাই ড্রেনের নোংরা জল বা রাস্তার ধারে জমে থাকা বর্ষার নোংরা জল এই নলের জলের সঙ্গে মিশে যাওয়াটা আজকাল আর কোন খবরই নয়। সেজন্য শহরে সারা বছর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে জমে থাকা জলের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মশা চাষ হয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া যেমন ছড়ায়, তেমনি নল বাহিত জলের মাধ্যমেও টাইফয়েড, আন্ত্রিক বা জনডিসের মতো রোগও হয় অনেকের। গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে মাঠে-ঘাটে পায়খানা করার কারণে শুধু হুক-ওয়ার্ম সংক্রমণ হওয়া নয়, আরো নানান স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। এই ব্যাপারটিতে শহুরে মানুষজন অনেকেই অবহিত। কিন্তু এর উল্টোদিকে আমরা, যারা স্যানিটরী ল্যাট্রিন তৈরি করে নিয়েছি, তারাও কিন্তু অনেক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যার জন্ম দিচ্ছি। স্যানিটরী ল্যাট্রিনের গ্যাস-পাইপে প্রায়ঃশই তারের জাল (বা নিদেনপক্ষে মশারী-ছেঁড়া) লাগাতে আমাদের মনে থাকে না। সেজন্য এগুলি হয়ে যায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে মশার বংশবৃদ্ধি করার এক উর্ব্বর জায়গা। শহরাঞ্চলে এতো মশা আর মশা থেকে হওয়া রোগগুলির পেছনে এই কারণটিও ফেলনা নয়। অট্টালিকাবাসী শহুরেদের হূকওয়ার্ম হওয়ার সম্ভাবনা নেই; সাবান মাখেন, তাই দাদ-হাজা হয় না। (তবে নানা কেমিক্যাল খাওয়া ও মুখে-গায়ে লাগানোর জন্য অ্যালার্জি ঘটিত চামড়ার রোগ অবশ্য অনেকেরই হয়)! এনারা পায়ে সবসময় জুতো পরেন, তাই পায়ে কড়া (Corn) হয় না; শ্যাম্পু-ট্যাম্পু করেন, তাই মাথায় উকুন হয় না — এসবই ঠিক। কিন্তু এসবের সব সুফল 'আধুনিক' হতে গিয়ে শেষ হয়ে গেল যে! নিত্যনুতন 'ফ্যাসান' অনুসরণ করতে গিয়ে ভুল খাওয়া-দাওয়া বা ভুল জীবন-যাপন প্রণালী অনুসরণ করার কারণে ক্ষতির পরিণাম লাভের থেকে অনেক সময়ই বেশি হয়ে যায়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের হার দিয়ে মোটামুটিভাবে মানুষের

রক্তাল্পতা আছে কিনা তা বোঝা যায়। অবাক কাণ্ড! প্রসূতি মায়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের এই হারে গ্রাম-শহরের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। একজন সুস্থ মানুষের রক্তে শতকরা ১৪ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকা উচিৎ, অথচ শহর গ্রাম নির্বিশেষে অধিকাংশ গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এই হার মাত্র শতকরা ৫-৯ গ্রাম! কেন এমন হবে? হবে, তার কারণ আছে। খেতে না পাওয়া আর খেতে না জানা — দুটোরই শেষ ফলাফল একই। শহরের শিক্ষিত মানুষজনেরাও অধিকাংশই খেতে জানেন না এবং খাদ্যা-খাদ্য বিষয়ে যা জানেন তা ভুল। লোভে পড়ে বাজার থেকে দাম দিয়ে কুখাদ্য কিনে খেলে তাতো আর শরীরের কোন কাজে লাগে না। তাছাড়া নারী -পুরুষ সবারই বেহিসেবী জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের কারণেও অনেক অসুখ-বিসুখ শরীরে এসে বাসা বাধে। যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন — তাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থাকা উচিৎ মাছ-মাংস-বাটার-ঘি-ডিমের মতো উচ্চ ক্যালোরির খাবার। কিন্তু এসব খাবার আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষজনের কেবলমাত্র স্বপ্নেই জোটে। এগুলি খান কারা ? যারা সারাদিন প্রায় কোন শারীরিক পরিশ্রম করেন না, তারা। এই ধরনের খাবার একটা বয়সের পর কিন্তু শরীরে বিষের মতো কাজ করে। আমরা ভাবি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেই বিন্দুমাত্র শারীরিক পরিশ্রম করব না, অথচা বাটার-ঘি থেকে উচ্চ ক্যালোরীর Fast food বা মাংস খেয়েই যাবো, অথচ চর্ব্বি হবে না, Blood sugar হবে না, কোলেস্টেরল বাড়বে না — মামাবাড়ীর আবদার নাকি?

এতো গেল অপপুষ্টির দিক। এবার কিছু অপুষ্টির কথা আলোচনা করা যাক। মেয়েদের কথাটা প্রথমেই তোলা ভাল, কারণ Fashionকে অনুসরণ করার জন্য মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় একশোগুণ আগে ছোটেন, মেয়েরাই সাধারণতঃ রান্নাঘরে মেনু তৈরি করেন, মায়েরাই বাচ্চাদের খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলেন আবার খাওয়ার নামে অখাদ্য ভক্ষণ করাটাও অনেকটাই মেয়েদের একচেটিয়া। সন্ধেবেলা পেটভরে ফুচকা খেয়ে রাতে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শরীরের যা অবস্থা হয়, সারাদিন নির্জলা উপবাস দেওয়ার পর গুড়জলে ভেজান চিঁড়ে বা লুচি পরোটা খাওয়ার পরের অবস্থা হয় একই। উল্টা-সিধা খাবো, আবার পেট-রোগে ভুগবো না, তা হয় না। ছেলেরা সন্তান প্রসবও করে না, আর বান্ধবী, বৌ বা শ্যালিকাদের পাল্লায় না পড়লে ফুচাকা দোকানের সামনেও দাঁড়ায় না। তবে বাঙালি ছেলেরা কি সবাই সুস্থ্য-সবল? আদৌ তা নয়, তবে ছেলেদের অপুষ্টির কারণ ও ধরণ আলাদা। গ্রামে তো বটেই, শহরেও সাধারণ নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়িতে পুষ্টিকর কোন খাবার (বাবা-মায়ের হিসাবে পুষ্টিকর) বাড়িতে এলে তাতে প্রথম অধিকার বাড়ির ছেলেদের। মাছের মুড়োই হোক বা দুধের সর — এসবই বাড়ির

পুত্রসন্তানটির প্রাপ্য। তাকে দেওয়ার পর কিছু থাকলে তা বাড়ির 'কর্তার' প্রাপ্য। তরপর অন্যদের কথা ভাবনাতে আসে। সুতরাং যেভাবেই হোক, পুরুষরা ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের তুলনায় একটু ভালো খাদ্য বা যত্ন-আত্তি পায়। স্বাস্থ্য-সচেতনতা না থাকলে অবশ্য এসবের কোন গুরুত্বই থাকে না। এরপর বয়ঃসন্ধি থেকে কিশোর-কিশোরীদের অন্য সমস্যা শুরু হয়। এই সময় ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ করে অনেকটা বেড়ে ওঠে, তাই অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাদের। সুখাদ্য সম্পর্কে প্রায় কোন বাবা-মায়েরই কোন ধারণা নেই, আর এই সুযোগটিকে কাজে লাগানোর জন্য স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে অ্যপ্রন পরিয়ে কিছু সুদর্শন যুবক বা যুবতীকে ডাক্তার সাজিয়ে তাদের মুখ দিয়ে বাড়ন্ত বাচ্চাদের Health tonic খাওয়ানোর জন্য দূরদর্শনে দিন রাত প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপনের চাপে শাক-সব্জি, ডিম-দুধ-মাছ-মাংস — এসব স্বাভাবিক খাদ্যের গুরুত্ব ভুলে গিয়ে বাচ্চাদের Health tonic ও Brain tonic খাওয়াতে বাবা-মায়েরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কাজেই ক্ষমতার বাইরে গিয়েও এসব tonic কিনতে দোকানে ছুটতে হয়। আর এগুলি বেচতে পারলে টনিক কোম্পানী, দোকানদার, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী — সবার লাভ। সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন যে একশো পঁচিশ-দেড়শো টাকার Planned Food গুলিকে তৈরি করতে খরচ পড়ে গোটা কুড়ি টাকা, আর আপেল-আঙুর-আনারস-বেদানার ছবি ছাপান প্যাকেটে মোড়া ৪৫-৫০ টাকা মূল্যের 'বোতল' টনিকগুলি তৈরি করতে খরচ পড়ে চার-পাঁচ টাকা, বাকি টাকাটা উল্লিখিত 'ত্রয়ী'র পকেটে যায়। অথচ ভিটামিন টনিক সহ সব ধরনের টনিক, কাশির মিক্সচার — এসব ঔষধের কোনটাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ চিকিৎসা সংক্রান্ত সংস্থা (WHO) কর্তৃক ঔষধ হিসাবে পরিগণিত নয়। অবশ্য আমরা নিজেরাও কম যাই না। শরীরে দুর্বলতা বোধ করলে বা অসুখ-বিসুখ হলে নিজেরাই এইসব টনিক কিনি, কিংবা 'লিভারের ঔষধ' কিনি। 'লিভার' কি জিনিস, তার কাজ কি, অসুস্থতার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক — এসব কিছু জানার-বোঝার কোন প্রয়োজন নেই — লিভার টনিক বা ভিটামিন টনিক খেতেই হবে। মানুষ তার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যেই পেতে পারে, বা অতিরিক্ত ভিটামিন খাওয়া শরীরের পক্ষে মারাত্মক হয়ে গিয়ে Hypervitaminosis সংক্রান্ত নানান অসুখ-বিসুখ হতে পারে — এসব কথা শোনার, বোঝার কোনো প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করে না। আমাদের এই চাহিদা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আরো বাড়িয়ে পরে তা পূরণ করার জন্য বাজারে হাজারো কোম্পানীর হাজারো টনিক উপস্থিত! এগুলির অধিকাংশের মধ্যে সত্যি সত্যি কতোটুকু কি ভিটামিন থাকে জানা নেই, তবে চিনি ও অ্যালকোহল (মদ) অবশ্যই থাকে। ঔষধ-হিসাবে এগুলি

তাই শরীরের জন্য পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়।

গ্রাম ও শহরের বয়ঃসন্ধির অধিকাংশ কিশোর সবার আগে শেখে বিড়ি-সিগারেট খেতে, তারপর ধরে মদ। মদ খাওয়ার হাতে খড়ি করার জন্য আজকাল মদ দোকান বা Bar -এ যেতে হয় না, পাড়ার ক্লাবঘরগুলি তবে আছে কিসের জন্য? এখন তো পলিথিন প্যাকে মোড়া দেশি মদ অনেক জায়গায় পান দোকানেও পাওয়া যায়! এর পর আনুসঙ্গিক আরো অনেক নেশা অনেকেরই সঙ্গী হয়। সুতরাং যা হওয়ার তাই হয়। বিড়ি-সিগারেটের হাজারো ক্ষতিকারক প্রভাবের মধ্যে একটি হল ক্ষিদে কমিয়ে দেওয়া। বয়ঃসন্ধি থেকেই যারা ধোঁয়াজীবি বা তরলজীবি, তাদের অপুষ্টি নিয়ে কি-ই বা আর আলোচনা করা যাবে?

এবার একটু গৃহবধুদের কথায় আসি। হালের অধিকাংশ অধিকার সচেতন, চর্বিবহুল আধুনিকা গৃহবধুদেরও আধঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে শাড়ি-ফাড়ি কেনাকাটার পর বাড়ি এসে দোতলায় উঠতে গিয়ে দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়। এইসব শরীর নিয়ে মুখে-গায়ে কেমিকেল মেখে সাজলে হয়তো 'সুন্দরী' বলে পরিচিত হওয়া যায়, সুষ্ঠুভাবে বাঁচার আনন্দ পাওয়া যায় না। শুধু মাছ-মাংস-বাটার-ঘি -এর মতো উচ্চ ক্যালোরী সম্পন্ন খাদ্য খেলেই হবে না, সুস্থ থাকার জন্য ঐ ক্যালোরীগুলিকে খরচ করতেও হবে। সেজন্য প্রয়োজন হয় শারিরীক পরিশ্রম করার। তা না করে সারাদিন বাথরুম-কিচেন-ডাইনিং-বেডরুমের মধ্যে জীবন-যাপন করলে আর পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে রিমোট কনট্রোলে টিভি দেখতে দেখতে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে দিবানিদ্রা দিলে শরীরে চর্বিতো জমবেই। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বদহজম, অ্যাসিডিটি, ব্লাড সুগার, মাথাধরা আর ব্লাড প্রেসার সংক্রান্ত উপসর্গগুলি। অথচ গ্রাম থেকে আসা, সবকিছু খেতে চাওয়া ও কিছু খেতে না পাওয়াতে অভ্যস্ত, অস্বাস্থ্যকর কিছু অভ্যাস 'বৌদিমণিদের' কথায় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া, বাড়িতে থাকা কাজের মেয়েরা বরং শহরে এসে এঁটো-কাঁটা খেয়েও বেশ সুস্থ থাকে। অধিকাংশ 'বৌদিমণি' বা 'দিদিমণিরা' আবার এদের স্বাস্থ্যকে মনে মনে বেশ হিংসে করেন, অথচ একবারও নিজেদের স্বাস্থ্যহীনতা আর কাজের মেয়েগুলির স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার কারণটা খোঁজার চেষ্টা করেন না। তবে দিদিমণি-বৌদিমণিদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এইসব মেয়েরা গ্রামে বিয়ে হয়ে এমন সব পরিবেশে গিয়ে থাকে, যেখানে দুবেলা দু'মুঠো খাদ্যই জোটে না, তো স্বাস্থ্য-সচেতনতা! সেখানে সাবানের ব্যবহারটিও অনেকক্ষেত্রে অন্যদের ব্যঙ্গের বিষয়। এর ওপর আছে বছর বছর সন্তানের জন্ম দেওয়ার ধকল। তাই অচিরে ওরাও দুর্বল আর ক্ষীণজীবি হয়ে যায়। সুতরাং গড়পড়তা মায়েদের শারীরিক অবস্থা

গ্রাম-শহর সর্বত্র প্রায় একই রকম। একজন মহিলা, অপুষ্টিজনিত দুর্বলতার কারণে শরীরটাকে সারাদিন টেনে নিয়ে যাওয়াই যার একটা বোঝা টানা, তিনি কিভাবে একটি সুস্থ সন্তানের মা হতে পারেন? কি করেই বা ভালো ঘরণি হতে পারেন যখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অশক্ত শরীর নিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে যৌনজীবন যাপন — সবকিছুই 'দায়িত্ব' হিসাবে পালন করে চলেন? রক্তহীন, ক্ষীণজীবি, দুর্বল স্বাস্থ্যর মায়েদের বুকে দুধ না থাকার (অথবা শহরাঞ্চলে কারো কারো থাকলেও বুকের গঠন খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় না খাওয়ানোয়) সন্তান তার মায়ের কাছ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকুও পায় না। কৌটোয় ভরা গোরুর দুধে তো আর বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবডি থাকে না। ফলে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের শুধু খড় আর জল খেয়ে বেঁচে থাকা গোরু আর তার শাবকের মতো মানুষের মধ্যেও বংশপরম্পরায় দুর্বল মা ও দুর্বল বাচ্চা — এই চক্র চলতেই থাকে। এই চক্রব্যূহ থেকে বেরোনোর রাস্তাটি কি? সেই রাস্তা খোঁজার জন্য সবার আগে প্রতিটি বাবা-মায়ের দরকার নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, জানা-না জানাগুলোকে বিশ্লেষণ করা এবং নিজেদের ভুল জানাগুলোকে সংশোধন করা। বাবা-মা এবং সংসারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সুস্থ অভ্যাস থাকলে সেগুলি আর জোর করে বাচ্চাদের শেখানোর প্রয়োজন হয় না। এর পর সন্তানকে সঠিক খাদ্য সঠিক হিসাবে খেতে শেখানোটা তার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি, কারণ ভবিষ্যতের একটি মানুষের জীবনের ভিত এখান থেকেই গড়ে ওঠে। নিজেরা স্বাস্থ্য সচেতন হলেই কেবলমাত্র সন্তানকে স্বাস্থ্য-সচেতন করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এইসব ফুচকা আর ঠাণ্ডাপানীয় লোভী মা আর সিগারেটখোর-মদখোর-বাবাদের কি সেই সুমতি হবে?

প্রথা, সংস্কার ও স্বাস্থ্য

এক

মানবশিশু পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকেই তার বাবা-মা-আত্মীয়স্বজন এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে নানান বিষয়ে শিখতে শিখতে ধীরে ধীরে বড় হয়। এরপর শিশু বড় হয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে গেলে একটা সময় আসে যখন তার শিশুবয়স থেকে শিখে আসা ব্যাপারগুলো তার নিজের কাছে হয়ে যায় নিয়ম, অনেক ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় নিয়ম। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে যখন একই সঙ্গে সব শিশু একই ধরনের পরিবেশ ও একই ধরনের সংস্কার-বিশ্বাসী পরিজনদের মধ্যে বড় হয়, তখন এই 'অপরিবর্তনীয়' নিয়মগুলো আস্তে আস্তে পরিণত হয় বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার উপযোগী সামাজিক নির্দেশে। এভাবে শোনানো-শেখানো কথা বা কাজের নির্দেশগুলো বংশ-পরম্পরায় মানুষের মনে স্থায়ীভাবে বাস করতেই থাকে। এগুলিই সংস্কার। আর 'প্রথা'গুলোতো পরিজনরাই সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মের মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এক পুরুষ থেকে পরের পুরুষ (Generation) অবধি চলতে থাকা প্রথা ও সংস্কারের এই প্রবাহের মধ্যে খুব ধীরগতিতে কখনও সামান্য অদল-বদল হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ও না। যে জনগোষ্ঠী অন্যদের থেকে যতো বেশি দূরে থেকে নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা থেকে যতো বেশি দূরে থাকার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে প্রথা ও সংস্কারগুলো সংখ্যায় ততো বেশি হয় এবং দৃঢ় হয়। সংস্কার ব্যাপারটি এমনই যে, প্রবলভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন এক জনগোষ্ঠীর একজন মানুষ তার নিজের জনগোষ্ঠীর সংস্কারগুলোর অপ্রয়োজনীয়তা ও ক্ষতিকারক দিকগুলি কিছুতেই বুঝতে পারে না, অথচ অন্য জনগোষ্ঠীর সংস্কারগুলো তার কাছে যুক্তিহীন, হাস্যকর, অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। হয়তো নিজেকে এবং অন্যকে বিচার করার আলাদা মাপকাঠি ব্যবহার করার মানুষ মাত্রেরই যা প্রবণতা, তাই এখানেও কাজ করে চলে। অনেক সংস্কারই জনগোষ্ঠীগুলির নানান তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অতীতে গড়ে উঠেছিল।

যে যুগে, যে পরিস্থিতিতে এইসব সংস্কারগুলি গড়ে উঠেছিল, তখন হয়তো এগুলি গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল, হয়তো বা প্রয়োজনও ছিল। পরবর্তীকালে যথারীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ মানুষ ভুলে গিয়ে বাহ্যিক প্রয়োগের দিকগুলিকে কেবলমাত্র কঠিন ও কঠোর করেছে। আস্তে আস্তে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে নুতন করে সংস্কারগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিচার করার। এখানেই অনেক যুক্তি-তর্ক-আলোচনার জায়গা আছে। কোন জনগোষ্ঠীর কোন প্রথা বা সংস্কার বর্জনীয়, কোনটা গ্রহণীয় — তা কে ঠিক করে দেবে? অন্যেরা তা মানবেও বা কেন? জনগোষ্ঠীর বাইরের কারোর মতামত, তা যতোই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, এক্ষেত্রে সাধারণভাবে শুধু উষ্মার জন্ম দেওয়ারই ক্ষমতা রাখে। কোন জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন কেবলমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি চাপটা আসে জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই। রাষ্ট্রের এক্তিয়ার ও রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহারও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যদিকে একই গোষ্ঠীভূক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একই সংস্কারের মূল সবসময় একই গভীরতা অবধি প্রসারিত নাও হতে পারে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বাইরের খোলা হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে একজন যে সংস্কারটির ক্ষতিকারক প্রভাব বুঝতে পারল, গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করা অন্যজন যে তা পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া আজকের দিনেও কোন একটি জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রথা ও সংস্কারই অপ্রোয়জনীয় বলে কেউ মনে করে না। অন্যদিকে আমাদের অজান্তে অতীতের মতো আজও তো মানুষজনের মধ্যে নুতন নুতন অনেক সংস্কারের, প্রথার জন্ম হয়ে চলেছে প্রতিদিন। সেগুলোর সবগুলোই যে প্রয়োজনীয় বা যুক্তিগ্রাহ্য, তা তো বলা যাবে না। তাই নয়া-পুরানা সব সংস্কার বা প্রথার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আছে ঝাড়াই বাছাই করার। এইভাবে ঝাড়াই-বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া আর খোলা মনে প্রতিদিন সেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই একটি জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রকৃত উন্নতির রাস্তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

প্রথা ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলতে পারে বিভিন্ন ধারাতে, তবে এখন সাধারণভাবে সেইসব প্রথা ও সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যেগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। এক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য — দুইয়ের কথাই ভেবে দেখতে হবে। গ্রামবাংলাতেই আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ মানুষ বসবাস করেন, সেজন্য গ্রামবাংলার মানুষজনের জীবন-যাপনের তথা প্রতিদিনের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা স্বাস্থ্যহানিকর অভ্যাসগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

'গ্রাম বাংলার মানুষজন' কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় গ্রামে বাস করা মানুষকে বোঝাতে, তবে আমাদের রাজ্যে বসবাস করেন নানান জনগোষ্ঠী। হরেক বিচিত্র ধরনের জীবনযাত্রা তাদের। আবার একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার, শিক্ষার ও সংস্কারের মানুষ থাকেন। তবে শহরবাসী মানুষজনের মধ্যে যেমন ধর্ম-জাত-আর্থিক অবস্থার হের-ফের থাকা স্বত্ত্বেও অনেকটা একই ধরনের জীবন-যাপন প্রণালী অনুসরণ করার চেষ্টা দেখা যায়, গ্রামে তা দেখা যায় না। গ্রাম্য সমাজের নানান স্তর আছে। ধর্ম তো আছেই, তবে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এই স্তর নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয়। যদিও সংস্কার ব্যাপারটি কোন ভাষা ব্যাকরণের মতো ভাগ করে করে আলোচনা করার কোন বিষয় নয়, তবু বাংলার গ্রামাঞ্চলে চালু থাকা ক্ষতিকারক সংস্কারগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে — ধর্মীয়, সামাজিক, খাদ্য-সম্পর্কিত ও আধুনিকতার অনুসারী ক্ষতিকারক প্রথা ও সংস্কার — এইভাবে।

প্রথমেই ধর্মীয় প্রথা ও সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধর্ম কি? 'যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম' — কেবলমাত্র ধর্মের এই অর্থ মেনে নিয়ে মানুষ আজকের দিনে কোন একটি ধর্মের নামে যেসব বিষয়কে মেনে চলে তার সবগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মানব সভ্যতার প্রথম দিকে সূর্য, বায়ু, আগুন, বৃষ্টি, বন্যা, খরা, অন্ধকার, আলো, অসুখ-বিসুখ, নানান ক্ষতিকারক জীবজন্তু ও অন্যান্য নানান প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু বা শক্তির প্রতি ভয় থেকে জন্ম হয়েছিল প্রকৃতিরই অংশ হিসাবে নানান দেবতার। তারপর মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রকৃতির ধরণ বদলেছে, প্রয়োজন বদলেছে, আর সেজন্য প্রয়োজন হয়েছে পুরানো ধর্মমত বদলে যুগের উপযোগী নতুন ধর্মমত গড়ে তোলার। জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মমত সৃষ্টির যুগে এগুলি উদ্ভব হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল, তেমনি ক্রিশ্চান বা ইসলাম ধর্ম উদ্ভব হওয়ার যুগে বাতাবরণ ছিল এই ধর্মমতগুলি গড়ে ওঠার। পরবর্তীকালে প্রতিটি ধর্মের অনুরাগীদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে একাধিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হলেও সাধারণভাবে এইসব ধর্মগুলি ছিল অনেকটাই সংঘবদ্ধ (Organized) এবং অনুসারীরা মানুক বা না মানুক — এগুলির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিলই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়মগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য বা অর্থ মানুষ ভুলে গিয়ে শুধু নিয়মগুলিকে বিকৃত করেছে, এই বিকৃত রূপের বাহ্যিক আচরণীয় দিকগুলিকে দৃঢ় করেছে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মগুলি বর্তমান অবস্থায় তার সব প্রয়োজনীয়তাই হারিয়ে ফেলেছে।

'ধর্ম' ব্যাপারটাই একটি সংস্কার বলে অনেকের অভিমত। সেই তর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, অনেক সময়ই মানুষ নিজের মেনে চলা সংস্কারগুলিকেই ধর্মের অঙ্গ বলে ভেবে নিতে ভালোবাসে। এইভাবে ধর্ম ও সংস্কার যখন মিলেমিশে যায় এবং একের থেকে অন্যকে আলাদা করা সহজ হয় না — তখনই তা কিন্তু মানুষের পক্ষে, সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে যায়। অথচ ধর্ম ও সংস্কারের খিচুড়িকে যারা ধর্ম বলে পালন করে চলেন নিষ্ঠা ভরে, তাদের মগজ ধোলাই হয়ে গিয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে সংবেদনশীলতা যে পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাতে নতুন কোন কথা তারা শুনতেও চান না। সাধারণতঃ বংশ-পরম্পরাগতভাবে পালন করে যাওয়া নিয়মগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের উপর এক ধরনের গণ-সম্মোহণী প্রভাব বিস্তার করে। আজন্ম লালিত-পালিত আচরণগুলি সম্পর্কে মনে হঠাৎ করে কোন প্রশ্ন আসতেই চায় না। সেজন্য হঠাৎ করে কেউ এইসব বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে বসলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধের উন্মেষ হয় কেবল।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই জন্মসূত্রে হিন্দু। তবে 'হিন্দুধর্ম' বলতে কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুনে বাঁধা কোন 'মত'কে বোঝায় না। বেদ-উপনিষদের যুগের হিন্দুধর্মের সঙ্গে পুরাণের যুগের হিন্দুধর্মের মিল অতি সামান্যই। আবার বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম বা তান্ত্রিক ধর্ম থেকে গত শতাব্দী অবধি বেঁচে থাকা একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম — এসবও ব্যপক অর্থে হিন্দু ধর্মের মধ্যে পড়ে। নানান মতবাদ, নানান দল-উপদলের এক Common Platform হল হিন্দু ধর্ম। এই ব্যপকতার কারণেই ধর্ম ও সংস্কারের নানান মিশ্রণের ফলে আচরণীয় জটিলতাও এই ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই ধর্মগুলির কোনটি নিয়েই আজকের আলোচনা নয়। এই ধর্মগুলির নামে যেসব ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষ মেনে চলেন, সেগুলির মধ্যে যেগুলি ব্যাপক আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর, সেগুলি নিয়ে মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন তোলাই আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই হিন্দুদের পূজা-পার্বণ নিয়ে একটু ভাবা যাক। ধর্মীয় নির্দেশ যাই থাক, আমাদের রাজ্যে পূজা মানে শুধুমাত্র চিত্তশুদ্ধি আর নির্মল আনন্দলাভের কোন অনুষ্ঠান নয়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অনেক মানুষের অনেক কষ্ট-যন্ত্রণাও। পুজোর আলোর উজ্জ্বলতায় সেগুলো ঢাকা পড়ে যায় মানেই সেগুলোর অস্তিত্ব নেই, এমন মনে করে নিলেই সত্যি সত্যি সেগুলোর অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায় না। প্রথা ও সংস্কারের চাপে মানুষ অনেক কষ্টকেই তার স্বাভাবিক প্রাপ্তি বলে মেনে নেয়। বস্তুতঃ প্রখর যুক্তিবাদী মানুষ ছাড়া অন্যদের পক্ষে এইভাবে 'চালু' সংস্কারগুলি মেনে না নেওয়ার মতো মানসিক জোর অর্জন করা সম্ভব হয় না।

শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা বা তা থেকে অর্জিত ছোট-বড় ডিগ্রী মানুষের এই প্রবণতাকে রোধ করার ক্ষমতা রাখে না।

বাঙালির বারো মাসে আজকাল আর তেরো পার্বণ নয়, অসংখ্য পার্বণ। পুজোর চাঁদার অত্যাচার আর জুলুমবাজী এক শ্রেণির মানুষের কাছে চরম আতঙ্কের কারণ। আশ্বিন-কার্তিকের দুর্গাপূজা-কালী পূজার চাঁদার কথা ভেবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের কর্তার আতঙ্ক হয় না, এমন ঘটনা দুর্লভ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়ির লোকজনের আর ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়-স্বজনদের পুজোর সময় নুতন জামা-কাপড় কেনার খরচের আতঙ্ক। কিন্তু এইসব আতঙ্ক প্রকাশ করার কোন উপায় নাই, এমনকি সংস্কারের প্রভাবে এই আতঙ্কগুলিকে নিবারণযোগ্য কোন বিষয় বলে ভাবারও কোন ক্ষমতা মনের মধ্যে জন্মাতে পারে না। ফলে নিদারুণ চাপে এইসব বাড়ির কর্তারা হীনমন্যতাজাত অদ্ভুত এক মানসিক কষ্টে ভোগেন।

পুজোর এই 'সিজন' ছাড়াও বছরের অন্য সময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে মনসা পূজা, গণেশ পূজা ইত্যাদির নামে বাস-লরি থামিয়ে চাঁদা আদায় তো মফঃস্বলের প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। অকারণ যানজট, কাজের সময় নষ্ট — এসব তো আছেই, রাজনৈতিক দলগুলোর নানান লেজুড় সংগঠনগুলির চাঁদার সঙ্গে বাস মালিকদের বাসভাড়া বাড়ানোর দাবীর পেছনে এটিও একটি বড় কারণ। স্থানীয় প্রশাসন বা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষের ভাষায় এগুলি নাকি "ছেলে-ছোকরাদের কিছু নিয়ে থাকা"। কি হয় এইসব চাঁদার টাকায়? বারোয়ারি পুজোগুলির বাজেট কষতে বসে মদ-মাংস-নেশাদ্রব্য, আর বিসর্জনের বাজী কেনার টাকাটা আগে সরিয়ে রেখে তারপর পূজা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। দাদাদের থেকে ভাইদের মধ্যে পরম্পরায় চলা, মদ-গাঁজা বা সিদ্ধিতে হাতেখড়ি হওয়ার এক মাধ্যম হল এইসব বারোয়ারি পুজোগুলি। বাড়ির লোকজন যথারীতি ছেলে-মেয়েদের একটু আলগা ছেড়ে রাখেন এই সময়, আর ছেলেমেয়েরা সময়টা ব্যবহার করে নানান কিসিমের বদমায়েশির ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। পুজো নিয়ে সামান্য অজুহাতে ক্লাবে ক্লাবে কমবয়সি ছেলেদের ঝগড়া নেশাগ্রস্ত অবস্থার বোমাবাজিতে শেষ হয়। এখান থেকেই হয়তো শুরু হয় কোন এক গোপাল-গোবিন্দের এলাকার 'দাদা' হওয়ার প্রাথমিক পাঠ নেওয়া। ভদ্রবাড়ির শিক্ষিত ছেলেরা হোলির দিন নেশা করে রং খেলতে গিয়ে দিনদুপুরে ধর্ষণ করছে — এতো প্রতি বছরেরই ঘটনা।

আমরা সবই মেনে নিই কতো সহজেই। প্রতিমা বিসর্জনের মতোই মৃতদেহ

সৎকার করার মতো 'পূণ্যকর্ম' করার আগে পাড়ার যুবকদের যে উপাচারটি অবশ্যই প্রয়োজন, তা হল মদ। মদের ব্যবস্থা না করলে গ্রামাঞ্চলে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া যায় না। মুসলিমদের মধ্যে এসব উৎপাত এতোদিন ছিল না, তবে আজকাল কিছু কিছু জায়গায় মুসলীম ধর্মীয় উৎসবগুলোর জন্যও রাস্তাঘাটে চাঁদা আদায় শুরু হয়েছে। আসলে এতো সহজে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়ের এই ফিকিরটি খুবই লোভনীয়!

পূজা-পার্ব্বণের হুজুগ এক শ্রেণির মানুষের কাছে অবশ্য রোজগার-পাতি বাড়ানোর এক দারুণ মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে পরিমাণ শাড়ি-জামাকাপড় বিক্রি হয়, তার অর্ধেকও সারা বছরের বাকি অংশে বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ আছে। আজকাল অবশ্য 'চৈত্রসেল' বলে এক হুজুগ তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একই, বিক্রি বাড়ানো। যথারীতি এই সময় জামা-কাপড়ের দাম অনেক বেশি করে বাড়িয়ে দিয়ে সামান্য কিছু 'ছাড়' দেওয়ার লোভ দেখানো হয়। এছাড়া 'সস্তার' প্রচার করে বস্তাপচা মাল বা বিশেষভাবে তৈরি করা খারাপ কোয়ালিটির মাল খদ্দেরদের গছিয়ে দেওয়া হয়। হুজুগে বাঙালির তা বলে কি আর 'পুজোর কেনাকাটা' থাকবে না? আর পুজোর কদিন বাড়ির বাইরের 'ভালোমন্দ' খাওয়া-দাওয়াতো করতেই হয়। সেই খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তবে পূজা উপলক্ষ্যে সরকারী নিয়ম-কানুনকে কলা দেখিয়ে তারস্বরে সারারাত মাইক বা বক্স বাজানো বা বোমা ফাটানো শুধু বৃদ্ধ বা অসুস্থ মানুষদেরই ক্ষতি করেনা, প্রতিমা দর্শনকারী থেকে শুরু করে পুরোহিত মশায় — সবারই ক্ষতি করে। কিছু মাতালের তাণ্ডব নৃত্যগীত সহযোগে প্রতিমা-বিসর্জন তো আবার কেউ কেউ বেশ উপভোগের জিনিস বলে মনে করেন! এই প্রসঙ্গে রাত দুপুরে 'মাইক' লাগিয়ে 'আজান' দেওয়ার কথাও বলতে হয়। হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্ম উদ্ভব হওয়ার অনেক পরে মাইক আবিষ্কার হয়েছে। ধর্মে কিভাবে মাইক ব্যবহারের নির্দেশ থাকে তা বুঝতে পারি না। ধার্মিক বন্ধুরা জানলে তা বুঝিয়ে দিলে বাধিত হব।

পূজা-পার্ব্বণের চাঁদা, জামা-কাপড় কেনা বা 'ভালোমন্দ' খাওয়ার খরচ নিয়ে পরিবারের কর্তার যতোই রক্তচাপ বাড়ুক, এগুলি শহর-মফঃস্বলের নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষদের সমস্যা। পূজা ব্যাপারটি গ্রাম-বাংলায় অন্য ধরনের মারাত্মক সব সমস্যারও জন্ম দেয়। গ্রাম-বাংলায় পূজা মানেই যথারীতি একটি মেলা, ছোট-বড় যাইহোক, সেই মেলায় ঘুগনি-তেলেভাজা বা জিলিপি -অমৃতি-দানাদার — এসব খেয়ে গ্রামের মানুষের অনেকেরই চিরস্থায়ী পেটের রোগের উদ্ভব হয়।

এইসব তেলেভাজা মিষ্টিগুলি তৈরি করার কোন উপাদানই মানুষের খাওয়ার উপযোগী নয়। অবিক্রীত পোকায় ঝাঁজরা করা খেসারী, ও অন্যান্য ডাল ও ছোলা-মটর থেকে তৈরি করা বেসন; পাম তেল, ডালডা বা রেপসীডের নামে অর্ধেক দামে কেনা ও প্রতিদিন তা থেকে মরা ইঁদুর-টিকটিকি-পোকামাকড় ছেঁকে ফেলে ব্যবহার করা আলকাতারার আকৃতির তেল, মিষ্টিতে মেশান কাপড়-চোপড় রং করার বা হোলীতে রং খেলার জন্য তৈরি করা নানান রং, পচে নষ্ট হয়ে যাওয়া এক মিষ্টি থেকে তৈরি করা আরেক মিষ্টি — এসব আর যেই পারুক, মানুষ কখনও খেয়ে হজম করতে পারবে না। কিন্তু এও একটি দিক মাত্র। গ্রাম বাংলার বাড়ির বা পাড়ার পুজোগুলিতে (হরিপূজা ইত্যাদি) পূজার প্রধান উপাদান হল চিড়ে! এই চিড়ে গুড় দিয়ে ভেজান ঠাকুরমশাই। গ্রামাঞ্চলে মুদি দোকানে তালগুড়-আখগুড় সব থাকে খোলা মাটির কলসী বা টিনের পাত্রের মধ্যে। প্রায়ই ইঁদুর-ছুঁচোর পায়খানা বা আরশোলা-টিকটিকি-ইঁদুর বাচ্চার দেহাংশ এই সব গুড়ের মধ্যে থাকতে দেখা যায়। এই গুড় পুকুর-ডোবার জল দিয়ে গুলে চিড়ে ভিজিয়ে তৈরি করা হয় 'চিড়ে প্রসাদ'। এছাড়া খোলা পাত্রের মধ্যে কেটে রাখা, ধুলো পড়া, মাছি বসা কিছু ফল ও বাতাসা হয় এই প্রসাদের সঙ্গী। আজকাল বাতাসাতেও মেশান হচ্ছে কাপড় কাচা সোডা আর চক পাউডার। 'মিষ্টান্ন' হিসাবে সন্দেশ বা ঐ ধরনের কিছু মিষ্টিও এর সঙ্গে থাকে, যেগুলি কতোদিন আগেকার ছানা থেকে বিভিন্ন মিষ্টি হিসাবে তৈরি হয়ে পচে গিয়ে বার বার রূপ পরিবর্তন করে মিষ্টান্নে পরিণত হয়েছে, তা দোকানদাররাও অনেক সময় মনে রাখতে পারেন না। আবার মন্দিরে পুজোর সময় এগুলিকে 'প্রসাদে' পরিণত করার উদ্দেশ্যে সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল সিঁদুর তৈরি হয় বিষাক্ত পারদঘটিত যৌগ থেকে। প্রসাদের সঙ্গে এগুলি পেটে গেলে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শনিপুজো বা নারায়ণ পুজোর প্রসাদের প্রধান উপকরণ হল 'সিন্নী'। কলা, বাতাসা, আটা, না ফোটান কাঁচা দুধ, মধু ইত্যাদি দ্রব্যগুলি থেকে কিছু অপরিচ্ছন্ন হাতের চটকানোর মাধ্যমে তৈরি হয় এই উপাচারটি। এই উপাচারগুলির প্রতিটিই যে কোন সময় বিষিয়ে গিয়ে বিপত্তি বাধানোর ক্ষমতা রাখে। এছাড়া বড়-সড় পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে যেখানে উপাচারগুলি অনেক পরিমাণে লাগে, সেখানে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ভেজাল মেশানো এইসব দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত ধরনের পুজোর সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় পুকুর বা ডোবার জল, কারণ শাস্ত্রে নাকি টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করার বিধান নাই! অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরক্ষর এইসব গ্রাম্য ঠাকুরমশায়রা কোথা থেকে এমন শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন

করেন তা ওনারাই বলতে পারবেন। আজকের গ্রামবাংলার পুকুর-ডোবার জলের যা অবস্থা, তাতে মুখ কুলকুচো করাটাও মারাত্মক হতে পারে। এই জলে ভোজান গুড়-চিড়ে বা সিন্নীগুলি আবার পুজোর সময় বা তার আগে-পরে ঢাকা না দেওয়ার অবস্থায় ঘরের কোণে পড়ে থাকে। এইসব উপকরণগুলি বমি-পায়খানা-আস্তাকুড় প্রত্যাগত মাছিদের আহ্বান করার জন্য আদর্শ। অনেকসময় ধাতব পাত্রে এই জিনিসগুলি রাখলে তা ধাতুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিষিয়েও যায়। (যেমন $Cu - CuSO_4$ বা তুঁতে)। এইসব প্রসাদগুলি পেটে গিয়ে কি করতে পারে আর কি পারে না — তা মাঝেমধ্যে হলেও খবরের কাগজের এক কোণে দেখা যায় (উদাহরণ সংযুক্ত)। যা আদৌ দেখা-বোঝা যায় না তা হল গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষের আমাশয় ও অম্বলের ধাত বা পেটভরা কৃমি নিয়ে রক্তাল্পতায় ভোগার একটা কারণ হল এইসব প্রসাদ খাওয়া। অবশ্য ভক্তিমান-ভক্তিমতীদের বা ঠাকুরমশাইদের হাতের নোংরাভরা কালো কালো বড় বড় নখ প্রসাদ চটকানোর সময় কি কি সংক্রমণ ছড়াতে পারে, সেই প্রসঙ্গে আজ আর আসছি না।

প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মগরাহাটে প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শতাধিক গ্রামবাসী। প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই গ্রামবাসীদের পায়খানা, বমি শুরু হয়ে যায়। ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার মগরাহাটের হরিপুরে। অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য ওই গ্রামে তিনটি মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে বলে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে। খাদ্যের বিষক্রিয়া থেকেই এই বিপত্তি ঘটে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ এপ্রিল, ২০০৪

'হরির লুট' কথাটিতো এখন বাংলা বাগ্‌ধারার মধ্যে এসে গেছে, সেজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কথাটি ব্যবহৃত হয়। সত্যিকারের 'হরির লুট'? সারিবদ্ধ একদল মানুষ খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন করার ফাঁকে ফাঁকে ঝুড়ি থেকে মুঠোমুঠো বাতাসা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, আর ছেলে বুড়োরা সবাই 'প্রেমানন্দে' ধুলো থেকে সেই বাতাসা কুড়িয়ে খাচ্ছে — এই হল হরির লুট। ধুলো-ময়লা মাখা এই বাতাসা খেয়ে ঠিক কি কি রোগ হতে পারে — তা জানি না। তবে বৈষ্ণবধর্মের এই উপাচারটি এখন দক্ষিণবঙ্গে বেশ ছড়িয়ে গেছে। এই 'তৃণ হতে বেশি সহিষ্ণু' হওয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্মমত অনুসারেই 'অষ্টপ্রহর' (এক নাগাড়ে

চব্বিশ ঘণ্টা) বা চব্বিশ প্রহর (এক নাগাড়ে বাহাত্তর ঘণ্টা) হরিনাম সংকীর্তন করা হয়। যথারীতি মাইক সহযোগে দিনরাত একনাগাড়ে তা প্রচারও করা হয়। বুঝুন! আজকের দিনে একজন 'বৈষ্ণব'ও অন্যের অসুবিধা ঘটানোর আগে একবার ভেবে দেখার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেন না। একজন পরীক্ষার্থী, একজন নিদ্রাহীনতার রোগী, একজন অসুস্থ বা বৃদ্ধমানুষ — এরা আমাদের 'ধার্মিক' মানুষজনের সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না।

ধর্মীয় সংস্কার ও প্রথাগুলির বাহ্যিক আচরণীয় দিকগুলি মেনে চলতে গিয়ে শারীরিক ক্ষতিগুলির মতোই এগুলি কিছু কিছু মানুষের বিকৃত মানসিকতা তৈরি হওয়ার জন্যও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। যেমন ধরা যাক্, আমাদের গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের কথা। ধর্মীয় সংস্কার ও প্রথা পালনের নামে এনারা পায়খানা করতে গেলেই গলা অবধি স্নান করেন। শরীর অসুস্থ থাকলেও ছাড়ান নেই। ব্যাপারটা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে ওঠে বর্ষা আর শীতকালে। এছাড়া যখন-তখন হাত ধোয়া পা ধোয়া চলছেই। এই অভ্যাসগুলির সঙ্গে সত্যিকারের পরিচ্ছন্নতার আদৌ কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না, সবটাই আজন্ম-লালিত সংস্কারগুলি পালন করতে নিয়ম রক্ষার্থে করা। তবে মাঝখান থেকে হাতের-পায়ের আঙুলের মাঝে হাজা আর নখকুনি হয়ে থাকে সারা বছরের সঙ্গী। এছাড়া সারাবছর নাকভরা সর্দি, যেখানে সেখানে ফ্যাড়ফ্যাড় করে সর্দি ঝেড়ে হাতের তালুর উল্টোদিক দিয়ে মোছা সারাদিন ধরে চলছেই। বছরের অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকায় ভুগে ভুগে অধিকাংশের মেজাজও তাই খিটখিটে। বাঙালির মূল খাদ্য হল ভাত, আর এই ভাতের মতো অপবিত্র জিনিসও আর নেই। খেতে বসার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিয়মিত সাবান মাখা বা সপ্তাহে একবার নখ কাটার কথা এনাদের কাছে হাসির খোরাক, চরম অবাস্তব এক কথা। অথচ কোন কিছু ভাতের পাত্রের সাথে ছোঁয়া লাগলেই তা 'সকড়ি', এক মারাত্মক অপবিত্র ব্যাপার। ভাত ছোঁয়া হাত ভুলক্রমে জামা-কাপড়-বিছানা, মায় চেয়ার টেবিলে লেগে গেলে তৎক্ষণাৎ সব কাজ ফেলে ওগুলিকে ধুতে ছুটতে হয়। পায়খানা করার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা গ্রামবাসীরা তো বটেই, অধিকাংশ শহরবাসীও মনে মনে মানেন না। কিন্তু পায়খানা ঘরে যাওয়ার সময়কার গামছা বা কাপড় নিয়ে কতোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি-মানা-মানি। স্বাস্থ্য সচেতনতা আর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্কার মেনে চলা — দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। গ্রামবাংলার অনেক মহিলার কাজই হল সকাল থেকে সন্ধে অবধি নিয়ম করে শুধু কতকগুলো সংস্কার মেনে চলা। এইরকম জীবন যাপনে মানুষ আনন্দ কতোটা পায় বলা মুশকিল, তবে এনাদের এইসব আচরণের দ্বারা এনারা

চারিপাশে বাস করা মানুষজনের অনেকের জীবনই দুর্বিসহ করে তোলেন।

গ্রামবাংলার মায়েরা সারাদিন নানান গুরুত্বপূর্ণ সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন, যথা, ঘর নিকোন, ঝাঁটানো, রান্নাবান্না করা, পুরুষদের খাবার দেওয়া, গো-সেবা করা ইত্যাদি। এই কারণে স্নান করে ঠাকুরকে 'জল' দিতে (চন্দন চর্চিত তুলসী পাতাটি দিতে) বেলা দুটো-তিনটে বেজে যায়। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠলেও এতো কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য এতো বেলা অবধি এককাপ চা ছাড়া কিছু খাওয়ার সময় পান না। তাছাড়া ঠাকুর জল না পেলে কিছু খাওয়া পাপ! খুবই জোরালো যুক্তি। এরপর বাড়ির পুরুষদের তৃপ্তি করে খাওয়ানোর পর রান্নাঘরে তেমন কিছু পড়ে থাকে না। এর উপর তরকারী শেষ হয়ে যাওয়ায় তেঁতুল, কয়েতবেল ইত্যাদি কুখাদ্য দিয়ে খাওয়া হয় ভাত। তাই দিনের পর দিন অসময়ে খাওয়া ও অর্ধাহারে থাকা হল গ্রামের মেয়েদের ভবিতব্য। ওনারা অবশ্য এই ব্যাপারটিকে স্বামী-সংসারের জন্য আত্মত্যাগ করে পুণ্য অর্জন বলে ভাবেন। যে সব পুরুষ মানুষরা মাঠে খাটতে যান, তাদের খাদ্য-গ্রহণ প্রণালীও প্রায় একই রকম। এইরকম অনিয়মিত আহার, অর্ধাহার আর অত্যাচারের ফল হল অসুখ-বিসুখ আর স্বাস্থ্যহীনতা। এরপরেও বছরে অন্ততঃ ২০-২৫ দিন বিভিন্ন তিথি বা পূজা উপলক্ষ্যে 'বার' করার জন্য মহিলাদের সারাদিন চলে সশ্রম নির্জলা উপবাস। কোন ধর্মগ্রন্থে এরকম উপবাস করতে বলা আছে? কেন, পাঁজিতে! এই উপবাসগুলি আবার সাধারণতঃ ভঙ্গ হয় চিড়ে-গুড় দিয়ে তৈরি করা 'প্রসাদ' খেয়ে। অনেক সময় আবার উপবাস ভঙ্গের পর ভাত খাওয়ার নিয়ম নেই — লুচি মিষ্টি খাওয়ার নিয়ম। বাঙালির ঘরে ঘরে তাই অ্যাসিডিটি-গ্যাসট্রিক আলসার-আমাশয়-অ্যানিমিয়ার রোগী ভরে থাকাটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ — পরিবহণযোগ্য প্রসাদগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। সম্ভবতঃ এই প্রথাগুলি খুব পুরানো নয়, তবে গ্রামবাংলায় বেশ চালু। এর মধ্যে জগন্নাথদেবের 'খিচুড়ি প্রসাদ' হল শালপাতার ঠোঙায় বা পোড়ামাটির ভাঁড়ে করে কয়েকদিন ধরে দূর-দূরান্ত পাড়ি দেওয়া খিচুড়ি। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি, উপযুক্তভাবে ঢেকে না রাখা, চূড়ান্ত পচা এই অখাদ্যটিও 'প্রসাদ'! দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বাচ্চাদের অন্নপ্রাশনের সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় হল 'মহাপ্রসাদ'। এটিও পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদ, যা বাচ্চাদের জীবনের প্রথম খাদ্য হিসাবে অন্নপ্রাশনের দিন প্রথমেই খাওয়ান হয়। 'মহাপ্রসাদ' ব্যাপারটি একটু বিষদভাবে বুঝতে হবে। জগন্নাথদেবের কুঁড়িভোগ (মাটির ভাঁড়ে ভর্তি করা ভাত-তরকারী, প্রসাদ হিসাবে বিক্রি হয়) যেগুলি

অবিক্রীত থেকে যায়, সেগুলি আবার গরম করে কাপড়ে ছেঁকে মেঝেতে ঢেলে রোদে শুকনো করা হয়। এই সময় যথারীতি এগুলি মাছি ও পোকা-মাকড়ে ঢাকা থাকে। মাছিদের রস-শোষণ ও সূর্যালোকের তাপ ও এই দুই পদ্ধতির দ্বারা এই সেদ্ধ চাল শুকনো হয়ে গিয়ে আবার প্রায়-চালের মতোই আকৃতি ফিরে পায়। এই বস্তুটিকে পলিথিনে ভরে প্যাকেট করে বিক্রি করা হয় 'মহাপ্রসাদ' নামে। ধর্মভীরু হিন্দুদের কাছেও এই মহাপ্রসাদ 'সক্‌ড়ি' নয় কেন তা বোঝা দুষ্কর। জগন্নাথদেবের বিখ্যাত আরেকটি প্রসাদ হল 'মিষ্ট প্রসাদ'। এই বস্তুটি হল ময়দা দিয়ে তৈরি করা গুড় পিঠে। অবশ্য মিষ্টি দোকানের পচা মিষ্টির রস, গুড় এসবের সঙ্গে ময়দা বা আটা মিশিয়ে কালো রং-এর তেলে তা ভাজা। এই প্রসাদ নাকি কখনও পুরানো হয় না। তৈরি হওয়ার এক-দেড় মাস পরেও ছত্রাকে সবুজাভ হয়ে যাওয়া 'মিষ্ট প্রসাদ'ও সস্তা হওয়ার কারণে পূণ্যার্থীদের কাছে গ্রহণীয় অবস্থাতেই থাকে। যেকোন উৎসাহী ব্যক্তি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করলেই সব জানতে পারবেন।

ধর্ম নিয়ে কোন আলোচনাই সাধু-সন্তদের বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের বড় বড় ধর্মীয় মেলাগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের। এনারা এমনই তপস্যা করেন, যাতে চুলে দু-তিন হাত লম্বা জট ধরে যায়, যা আবার বেনী করে গুটিয়ে রাখতে হয়। আসল ব্যাপারটি অন্যরকম। অপরিস্কার চুলের সঙ্গে জড়ান হয় মেয়েদের ফেলে দেওয়া বড় বড় চুল, গরম ধুনো, ধুলো — এসব দিয়ে আস্তে আস্তে করে তৈরি করা হয় জটা। আমি একবার একজন সাধুর প্রায় সাত-আটফুট লম্বা জটা দেখেছি। সত্যি সত্যি কারো চুল এতো লম্বা হলে তার গিনেস বুকে নাম উঠে যেত! এসব জেনেও অবশ্য গেঁজাল সাধুদের প্রতি ভক্তি একটুও কমার কোন কারণ নেই। আবার এদেরই এক আধুনিক সংস্করণ তৈরি হয়েছে 'আধুনিক' মানুষজনকে ভোলাতে। সমস্যায় জর্জরিত মানুষের সমস্যা নিরসনের জন্য 'অব্যর্থ গ্রহরত্নের' নিদান দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন 'মা-বাবা'রা বড় বড় সব গহনা ও গ্রহরত্নের দোকান সংলগ্ন জায়গায় 'চেম্বার' করে বসেছেন। যেকোন দৈনিক পত্রিকার দ্বিতীয় পাতায় এরকম অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাবা-মায়েদের লৌকিক ফটোগ্রাফ সহ বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই দেখতে পাবেন।

জীবনে গুরুমন্ত্র না নিলে আর মাঝে মধ্যে মন্দিরে দেব-দর্শন না করলে অনেকেই কেমন যেন একটা মানসিক অতৃপ্তিতে ভোগেন। বড় বড় মন্দিরের সামনে-পেছনে যেসব বিচিত্র ধরনের ব্যবসার খেলা চলে, তার কিছু কিছু আমরা অনেকেই জানি। পুজোর ফুল-নৈবেদ্য-উপাচার থেকে পান্ডাদের পান্ডামি-ভন্ডামি

— এসব নিয়ে অনেক খবরই আমাদের অনেকের জানা। তবে ধর্ম নিয়ে আরো এমন কিছু ব্যবসা চলে, যা খুব কম মানুষই জানেন। এরকম এক ধরনের ব্যবসার কথা আলোচনা করা যাক। এটি একটি 'সম্প্রদায়গত' ব্যবসা। সাধারণতঃ এই ধরনের ব্যবসাগুলির হেড অফিস থাকে বাংলার বাইরে। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে চালু ও বিখ্যাত এই ধরনের যে ব্যবসাটি চলছে তা শুরু করেছিলেন এক বাঙালি 'গুরুদেব'। ইনি অবশ্য যথেষ্ট পরিণত বয়সে নিজের সন্তানের চেয়েও কম-বয়সি এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। (গুরুদেবের 'লীলা'!)। মনে করুন, আপনি এই সম্প্রদায়ের 'শিষ্য' হলেন (আসল গুরু বহুদিন মৃত, তার বংশধররাই এখন গুরু। এই গুরুদের প্রশিক্ষিত চ্যালা অথবা তস্য তস্য চ্যালাদের মধ্যে যারা মন্ত্র দেওয়ার অধিকারী — তাদের মাধ্যমে)। এরপর প্রতি মাসে গুরুদেবের আশ্রমের ঠিকানায় আপনাকে 'শিষ্য চাঁদা' পাঠাতে হবে। (প্রতিদিন প্রতিটি শিষ্যের কিছু টাকা জমিয়ে রাখার নিয়ম করা আছে এই উদ্দেশ্যে)। আপনার মতো লক্ষ লক্ষ শিষ্যই এইভাবে প্রতি মাসে টাকা পাঠান। এই টাকাগুলি এরপর ভাগাভাগি হবে। এর একটি অংশ আপনাকে 'বীজমন্ত্র' দেওয়া গুরু, ওনার গুরু — এভাবে পেয়ে যাবেন। বাকি অংশ আদি গুরুদেবের বংশধরদের ভোগে লাগবে! অবশ্য এই টাকার ছিটেফোটা অংশ আপনার শহরে থাকা 'প্রার্থনা মন্দিরের' বিশেষ অনুষ্ঠানের খরচের জন্য মঝে মধ্যে আসবে। কেমন সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থা! অবশ্য চিন্তা নেই — আপনারও পদোন্নতির আশা আছে — পরে আপনিও পদোন্নতির ফলে সাম্মানিক বেতের ছড়ি সহ শিষ্য তৈরি করার অধিকার — এসব পেতে পারেন। বিনা মূলধনে বংশ পরম্পরায় চলা এমন লাভজনক ব্যবসা কিন্তু খুব বেশি নাই।

আমাদের দেশে কয়েকটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দিগম্বর সাধু' হওয়ার চল আছে। এই সাধুগুলিও খুব সুবিধাজনক মানুষ নয়। এইসব সাধুদের গোষ্ঠীগুলি সুঠাম দেহের ছোট ছোট ছেলেকে ভবিষ্যতের 'সাধু' তৈরি করার মহৎ উদ্দেশ্যে যোগাড় করে। এই ছোট ছোট ছেলেগুলির শরীরে গোপন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে ছোট্ট একটি অপারেশন করে খোজা (Sterile) করা হয় বা জনন অঙ্গটিকে ভবিষ্যতের জন্য অসাড় করে দেওয়া হয় (Non-erectile penis)। অনেক সময় আবার জনন অঙ্গটিকে অস্বাভাবিক অবস্থানে চাপের মধ্যে দীর্ঘদিন রাখারও অভ্যাস করানো হয় এই একই উদ্দেশ্যে। এর ফলে শিশুটি বড় হয়ে 'কামজয়ী গুরুদেব' হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় সবসময় থাকেন, আর শিষ্যদের পাপ কমানোর কাজে সাহায্য করে বেড়ান। পাপী অথচ ভক্তিমান ও বিত্তশালী শিষ্যেরও কোন অভাব ওনাদের কোনদিনই হয় না। কামকে জয় করার নামে এই ভন্ডামি আজও ধর্মের অঙ্গ হিসাবে সমাজে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে চলেছে।

দুই

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রধানতঃ ধর্মই নির্ধারণ করেছে একটি জাতির সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, প্রথা আর চিন্তা-ভাবনাকে। কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ যখনই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে কিছু ভাবতে গেছেন, তখনই ধর্মগুরুদের বা ধর্মগুরু নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় হয়েছে সেইসব প্রতিবাদী বা ব্যতিক্রমী মানুষদের কণ্ঠরোধ করার জন্য। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অতীতে প্রতিটি যুগেই এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই সামান্য কয়েকজন ব্যতিক্রমীর হাত ধরেই মানবসভ্যতা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে।

আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ উন্নত দেশেই ধর্ম আর আগের মতো ততটা ক্ষমতাশালী নয়। মানুষ তার নিজস্ব মতামত, রুচি ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করার অধিকার অনেকটাই অর্জন করেছে। তবে অনুন্নত দেশগুলিতে সমাজের এক বৃহত্তর অংশে অতীতের জের হিসাবে অনেক ক্ষতিকারক প্রথা ও সংস্কার থেকেই গেছে, বরং বহুক্ষেত্রেই অতীতের সেই সংস্কার বা প্রথাগুলো তার রূপ বদল করে আরো অনেক বেশি ক্ষতিকারক হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ নিজেকে প্রতিদিন 'আধুনিক' হিসাবে গড়ে তোলার বাসনায় নিত্য-নতুন অনেক প্রথার জন্মও দিচ্ছে। এক দশক আগের আর আজকের যুবক-যুবতীর বিশ্বাস বা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে প্রায় কোন মিলই নেই। আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশগুলি মানুষজনের তথাকথিত উন্নত দুনিয়ার নানান সামাজিক প্রথার বেহিসাবী নকলনবিসী করা মারাত্মক সব সামাজিক সমস্যার পথ দিচ্ছে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম তো ইউরোপ-আমেরিকার মানুষজনের পোশাক-আশাক, খাদ্য, রুচি এবং চিন্তা-ভাবনার অবিকল নকল করাকেই মনে করে আধুনিকতা। যদিও এইরকম অনেক প্রথার বিরুদ্ধে ঐসব দেশগুলিতেই প্রতিবাদ উঠতে শুরু করেছে। দুটি দেশের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ থেকে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি — কোনকিছুর মধ্যে যেখানে কোন মিল নেই, সেখানে দুটি দেশের মানুষের একই ধরনের জীবন-যাপনের চেষ্টা শুধুমাত্র সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানান সমস্যার জন্মই দিতে পারে। অথচ একথাতো সবাই মানেন যে, যুক্তিবাদী যুব সমাজের দ্বারাই যেকোন সামাজিক পরিবর্তন অনেক দ্রুত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার দরকার — কোন মানুষ হঠাৎ করে একদিনে যুক্তিবাদী হতে পারেন না, তবে লাগাতার চেষ্টা করলে একদিন না একদিন কিছুটা যুক্তিবাদী নিশ্চয়ই হতে পারেন। অবশ্য যুক্তিবাদী হওয়া আর নিজের দিকে ঝোল টানার জন্য বা নিজের কাজকর্মের

সাফাই গাওয়ার জন্য কু-যুক্তি সাজানোর অভ্যেস — দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এ ব্যাপারে সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মানুষজনের একটা দায়িত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু ডিগ্রীধারী শিক্ষিত হলেই মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে যান না। যে 'শিক্ষিত' মানুষ সংস্কারকে যুক্তির উপর স্থান দেন — তাকে মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ মানুষ বলা যায় কি? এরকম মানুষের কাছ থেকে কি বা আশা করা যেতে পারে? মানুষের মনে সংস্কারবোধের মূল ছড়িয়ে থাকে মনের অনেক গভীরে। নিজেকে কু-সংস্কার বিরোধী বলে ভেবে নেওয়া বা প্রচার করা যতো সহজ, সত্যি সত্যি নিজের মন থেকে ঐসব সংস্কারগুলি তাড়িয়ে দেওয়া তার তুলনায় অনেক, অনেক কঠিন। অনেক বিখ্যাত সংস্কার বিরোধী মানুষের নিজের অথবা নিজের স্ত্রী ও সন্তানের গলায়, বাহুতে, হাতের আঙুলে বা কোমরে ঘুনসী, তাবিজ, মাদুলি বা 'গ্রহরত্ন' থাকে। নিজের সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়াম 'দামী' স্কুলে পড়ানো বা জামা-কাপড়ে, প্রসাধনে, চুলের স্টাইলে (যথা মেয়েদের বয়কাট চুল!) মডার্ন করার চেষ্টা অনেকেই করেন। কিন্তু সন্তানকে সত্যিকারের আধুনিক মনস্ক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন খুব কম মানুষ। জিন্‌স-এর প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা নব্য-আধুনিকাদেরও অনেকের হাতে মাদুলি বাঁধা থাকে, তবে যথেষ্ট আড়ালে। আর বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষজনের অনেকেরই তো প্রতিদিন পুকুর-ডোবায় স্নান করার সময় ডোবার জলে মাদুলি ধুয়ে তিনবার সেই জলপান করার 'নিয়ম' পালন করতে দেখা যায়।

এবার আজকের দিনের মধ্যবিত্ত মানুষজনের এক সামাজিক প্রবণতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই, যা আস্তে আস্তে করে একধরনের সামাজিক সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে। আজকের দিনের বাবা-মায়েদের এক তীব্র আকাঙ্খা হল ইংরাজী মাধ্যম কনভেন্ট স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে প্যান্ট-কোট-টাই-শ্যুতে অভ্যস্ত করিয়ে ফট্‌ফট্ করে ইংরেজি বলার ক্ষমতা তৈরি করানো। এই ধরনের স্কুলে একদম বাচ্চা বয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি না করতে পারলে যেন জীবনই বৃথা! বাবা-মায়েরা একবারও নিজেদের স্কুল জীবনের কথা ভাবেন না। দিন নাকি বদলে গেছে, এখন Competition এর যুগ। (আগে Competition ছিল না!) দেশীয় ব্যাপার-স্যাপার থেকে সবচেয়ে দূরে থেকে সবচেয়ে উঁচু Life Style বিষয়ে যেখানে বাচ্চারা শিক্ষা পায়, তাই নাকি কেবলমাত্র দিতে পারে সবচেয়ে উঁচু মানের শিক্ষা। বাজারের এই তীব্র চাহিদার যোগান দিতে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত স্থানেও বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার মতো ''নার্শারী-কেজি' থেকে 'সেকেন্ডারী' পর্যন্ত শিক্ষাদানের উপযোগী কতো মা মেরী, রোজ মেরী, মেরী ইমাকুলেট থেকে

ভগিনী নিবেদিতা মায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নাম জুড়ে কতো যে স্কুল গজিয়ে উঠেছে, তার কোন হিসাবও বোধহয় আমাদের শিক্ষা দপ্তরের কাছে নেই। বাড়িতে বাবা-মা বন্ধু-বান্ধব বাংলায় কথা বলে, স্কুলে মিসরা ইংরাজী বা হিন্দীতে, — এর মাঝে পড়ে এরা শিখছে না বাংলা, সঠিকভাবে না শিখতে পারছে ইংরাজী বা হিন্দী। এইসব স্কুলে ভর্তি করার পর সব বাবা-মায়ের দাবী তাদের সন্তানকে ফার্স্ট হতে হবে। হবেই। এর সঙ্গে ছবি আঁকা, গান, কবিতা আবৃত্তি বা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা — এসবেও ফার্স্ট হতে হবে। না হলে ছেলের কিছুই হল না। ভবিষ্যৎ পুরো অন্ধকার। একদম শিশুকাল থেকে এতো চাপ শিশু-কিশোরদের কতোটা ক্ষতি করে, তা কবিগুরু বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। এরপর একটু বড়ো হলেই এসবের সাথে যোগ হয় প্রাইভেট টিউশন। সেজন্য আজকাল আর ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলা করা বা ঘুরে বেড়ানোর কোন সময় ছেলেমেয়েরা পায় না। এই বৃত্তের বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোন কিছু জানার কোন সুযোগও এরা পায় না। খেলাধূলা না করায় শরীরের গঠন শক্ত-পোক্ত হয় না, শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ক্ষমতা হয় অনেক কম। অন্য দিকে নিরস পাঠ্য বিষয়ের বাইরের পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে নিরুৎসুক হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ভাবে বেঁচে থাকতেই এরা অভ্যস্থ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাপনাগুলিই কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আসলে সাধারণ মেধার বাবা মায়েরা নিজেরা নিজেদের সমস্ত না পাওয়াগুলো (যেমন ছাত্রজীবনে কোন বিষয়ে কখনোই প্রথম হতে না পারা) ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমে পেতে চান। এই উদ্দেশ্যে এক-একজন নিজের সাধ্যের অনেক বাইরের খরচকেও স্বীকার করতে বা নিজেদের জীবনের সমস্ত পাওয়াকে বন্ধক রাখতে বা অগ্রাহ্য করতেও তৈরি। মধ্যবিত্ত মানুষজনের এ যেন এক নতুন ধরনের সামাজিক হিস্টিরিয়া! এইসব বাবা-মায়েরা একবারও ভেবে দেখেন না যে তাঁদের সন্তান বাবা-মায়ের জিন থেকে কেবলমাত্র বাবা-মায়ের মতো সাধারণ মেধাই পেয়েছে। অসাধারণ হওয়ার মশলা যার মধ্যে আছে, সে যেকোন পরিস্থিতি পেরিয়ে গিয়ে অসাধারণ হবেই। সাধারণ কখনও কোনভাবেই অসাধারণ হয়ে উঠতে পারবে না। মেজে-ঘষে 'সাধারণ' কেবলমাত্র 'একটু ভালো সাধারণ' হতে পারে। তবে এর জন্য নিজের সমস্ত ক্ষমতাকে একদিকে ব্যবহার করার মূল্য হিসাবে তাকে অন্যদিকে অনেক কিছু হারাতে হবে। স্বভাবতঃই ছেলেমেয়েরা যখন বাবা-মায়ের আশার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না, তখন বাবা-মায়েদের মনে হয় তাদের এতো কষ্ট, এতো আত্মত্যাগ সব ব্যর্থ করে

দিল ছেলে-মেয়েরা। সেজন্য বকুনি আর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো বেশি করে মানসিক চাপে পড়ে গিয়ে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে যায়। এই রকম মানসিক অবস্থায় এরা যে কোন কিছুই করতে পারে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের আর্থিক জোরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়না। বাবা-মায়ের চেষ্টায় বা টাকার জোরে ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানো যায়, কিন্তু ছেলে-মেয়ের উপযুক্ত মেধা না থাকলে ডাক্তারি তার দ্বারা কোনদিনই হবে না। মাঝখান থেকে প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ — এসব সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ ছেলেবেলা থেকে না পাওয়ার জন্য এইসব ছেলেমেয়েরা কতকগুলো নিষ্প্রাণ, অনুভূতিহীন যন্ত্র-মানব হয়ে যাবে। বয়সকালে নেশা আর যৌনতা ছাড়া পৃথিবীতে উপভোগের কোন জিনিসের অস্তিত্ব আছে বলে এদের বিশ্বাসই হবে না। আজকাল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ড্রাগের নেশা বা হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে চূড়ান্ত ভোগের মধ্যে ডুবে য়াওয়ার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে অন্ লাইন লটারীর চোরা বালিতে ডুবে যাওয়া, আর তার খরচ জোগাড় করতে নানান অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়া — এগুলি কিন্তু হঠাৎ করে আসছে না। সেজন্য প্রত্যেক আধুনিক বাবা-মায়ের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিৎ — মন থেকে মনন বাদ দিয়ে যে জীবন, নিজেদের সন্তানের জন্য তাঁরা সেই জীবন চাইছেন তো?

৩

বিভিন্ন কারণে আজকাল মানুষ, বিশষতঃ শহুরে জীবন-যাপনের হাওয়া লাগা মধ্যবিত্ত মানুষজন, শাক-সব্জী খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। দূরদর্শন ও অন্যান্য মিডিয়ার বিজ্ঞাপনের জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, মাংস ও ডিমজাত খাবার বাচ্চাদের খাওয়ানোর প্রতি অধিকাংশ বাবা-মায়ের একটা ঝোঁক এসেছে। বাচ্চাদের শরীর গঠনের জন্য প্রোটিন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সব্জি খাওয়ানোর প্রয়োজনও কম নয়। সব্জি বলতে এনারা বোঝেন আলু। এই ব্যাপারগুলি সব মানুষের, বিশেষতঃ বাচ্চাদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। গাজর, শিম, টম্যাটো, লেবু, পেঁপে, কাঁচকলা, ঢেঁরস — এসব খাদ্যে যেসব খাদ্যপ্রাণ থাকে, তার অভাব ঘটলে বাচ্চাদের মারাত্মক সব রোগ হতে পারে, হচ্ছেও। গ্রামের নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির বাচ্চাদের তুলনায় শহরের বাচ্চাদের চোখ, দাঁত ইত্যাদির সমস্যা সেজন্য বেশি হতে দেখা গেছে। বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি থেকে যেসব খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থ (ভিটামিন ও মিনারেল) আমরা স্বাভাবিকভাবে পেতে পারি, সেগুলি কিন্তু বাচ্চাদের সঠিক শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। কৃত্রিম খাদ্যগুলি (কেক-চিপ্‌স ইত্যাদি) থেকে এগুলি সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। আর ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা ভিটামিন-মিনারেল রোগীদের ক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে পারলেও টনিক জাতীয় ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে বা গুঁড়ো দুধের সঙ্গে কৃত্রিম রঙ-গন্ধ সহ মিশিয়ে Health Tonic হিসাবে বাচ্চাদের নিয়মিত খাওয়ানো কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। এগুলি ছাড়াও আধুনিক জীবন-যাপনের অঙ্গ হিসাবে আইসক্রিম-চকলেট খাওয়া, ঠাণ্ডা-পানীয়, গরমকালে ফ্রিজের জল খাওয়া — এরকম নানা কারণে বড়দের মতো ছোটোদেরও নানান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে।

আজকাল বাচ্চাদের মধ্যে চটজলদি খাবার (fast food) খুবই জনপ্রিয়। চটজলদি খাবার এখন কেবলমাত্র রেস্তোরাঁতে গিয়ে খাওয়ার ব্যাপার নয় — বাড়ির রান্নাঘর অবধি অবাধ এদের দাপট। এখনকার মায়েরাও বহুজাতিক

কোম্পানিগুলোর সুচতুর বিজ্ঞাপনের মায়ায় নিজেদের সন্তানদের মতোই চটজলদি খাবারের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরলে চট করে চটজলদি খাবার তৈরি করে প্লেটে করে সামনে ধরার মধ্যে কি মজা! কিংবা বাড়িতে কোন অতিথি এসে পড়লে বা ছুটির দিনে খুব কম সময়ের মধ্যে কিছু সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে পারলে সময় বাঁচে, সবার বাহবাও পাওয়া যায়। আধুনিকতা ও সামাজিকতার দায় রক্ষাকারী এই fast food-এর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত একটু জানা যাক। চটজলদি খাবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয় চাইনিজ খাবার। চাইনিজ খাবার খেতে চাইনিজ রেস্তেরাঁতে আজকাল যেতে হয়না, বাড়িতেই এসব খাবার তৈরি করে খাওয়া যায়। সমস্ত রকম চাইনিজ খাবার তৈরি করার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় হল 'আজিনা মোটো' (Mono Sodium Glutamate বা MSG)। পরীক্ষাতে এটা প্রমাণিত, এই কেমিক্যালটি বাচ্চাদের মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া শিশুদের বৃদ্ধির হারও এতে অনেক কমে যায়। জাপানের ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের মতে — আজিনা মোটো থেকে ক্যানসারও হতে পারে। আজিনা মোটো শুধু চাইনিজ খাবারে নয়, লঙ্কার সস্, টমেটো সস্ এবং প্রায় সব ধরনের আচার তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। জাপানের হিরোসী সাতোমী (Hiroshi Satomi) ১৪০০ স্কুল ছাত্রের উপর গবেষণা চালিয়ে আজিনা মোটোর প্রভাবে বাচ্চাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুর ক্ষতি হওয়ার কারণে নানান স্নায়বিক রোগ লক্ষণের প্রকাশ হতে দেখেছেন। তিনি এই রোগের নাম দিয়েছেন চাইনিজ রেস্তেরাঁ সিনড্রোম (Chinese Restaurent Syndrome)। এছাড়া সিঙ্গাপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়াঙ হক বুন (Wong Hock Boon) দেখেছেন এই আজিনা মোটের প্রভাবে শিশুদের হাতে-পায়ের কাঁপুনি শুরু হয়। আজিনা মোটো মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মধ্যেকার স্নায়ু সঞ্চালকের (Neurotransmitter) পরিবর্তন ঘটায়। আজিনা আবার আমাদের খাওয়ার লবণের সঙ্গে মিশে গিয়ে শরীরে আরো মারাত্মক ক্ষতি করে। এর ফলে শিশুদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হতে পারে।

এতো গেল বিশেষজ্ঞদের অভিমত। লেখক নিজে আধপচা কুমড়োর সঙ্গে সামান্য কিছু টমেটো ও কৃত্রিম রঙ-গন্ধ মিশিয়ে 'টমাটো সস্' তৈরি হওয়া দেখেছেন। বাজারের এইসব অতিসস্তার চিলি সস, সয়াবীন সস, টমাটো সস্ — এসব যে ঠিক কি কি দিয়ে তৈরি হয়, তা জানতে গেলে ব্যাপক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নানান সংরক্ষক (Preservative) যুক্ত খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারটি। যেকোন খাদ্যবস্তু বা তৈরি করা সব

ধরণের খাবারই পচনশীল। এইসব খাদ্যের পচন রোধ করে খাবারগুলিকে দীর্ঘকাল 'টাটকা' রাখার ক্ষমতা আছে কিছু কেমিকেলের — এগুলিই সংরক্ষক। অনেক কেমিকেলেরই এই 'গুণ' আছে — তবে এইসব কেমিকেলগুলির মধ্যে যেগুলির মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেমন মারাত্মক কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নেই — সেগুলিকেই খাদ্যের সাথে মেশানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এই কেমিকেলগুলির গঠন, কার্যকারীতা ও ক্ষতিকারক প্রভাবের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগও আছে (Class I, Class II ইত্যাদি)। আজকাল নানান সস্-জ্যাম-জেলি-পাউরুটি-কেক থেকে শুরু করে ফিসফ্রাই-প্যাটিস-ফলের রস জাত ঠাণ্ডা পানীয়-প্যাকেটের দুধ-পনীর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে কৃত্রিম রং গন্ধের সাথে নানান সংরক্ষকও মেশানো হয়। মজার ব্যাপার হল — এইসব খাদ্যগুলির মধ্যে কোনটির সাথে কি সংরক্ষক মেশানো হয়, তা কেউ বলে না, প্যাকেটের ওপর শুধু "Contains permitted colour, added flavour and permitted class I / class II preservatives ...." লিখেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এতেও শেষ নয়, এর পরও যাতে কোন খাদ্য বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জারিত হয়ে না যায়, তার জন্য আবার কিছু কিছু কেমিক্যাল (Anti-Oxidant) খাদ্যদ্রব্যের সাথে মেশানো হয়।

এই প্রসঙ্গে দুটি ব্যাপার ভাবতে হবে। প্রথমতঃ খাদ্যের মধ্যে যে সংরক্ষকটি মেশানো হয়েছে তা আদৌ কোন নিরাপদ সংরক্ষক কিনা, এই ব্যাপারে কেউ কিছু প্রশ্নই করতে পারে না। কারণ খাদ্যে মেশানো সংরক্ষকের নাম প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই লেখা থাকে না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অবধি শরীরে যেকোন একটি সংরক্ষক গেলে সেটি তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষতি করে কিনা — তা বিচার করে 'নিরাপদ' সংরক্ষকের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। একই কথা খাটে খাদ্যে মেশানো 'নিরাপদ' রং (Permitted Colour) গুলি সম্পর্কেও। এখন যদি দীর্ঘকাল যাবৎ বা অত্যধিক পরিমাণে এইসব সংরক্ষক মানুষের পেটে যায়, অথবা একসঙ্গে পাঁচ রকমের খাদ্য উপকরণ দিয়ে কোনো খাদ্য তৈরি করলে বা পাঁচ রকমের খাবার খেলে যদি পাঁচটি বিভিন্ন রকমের কেমিকেল সংরক্ষক ও পাঁচটি বিভিন্ন রকমের কেমিকেল রং একসঙ্গে পেটে যায়, তার তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘকালীন ব্যবহারের ফলাফল ঠিক কি হতে পারে — তা কিন্তু কেউ জানে না। শুধু অজ্ঞ চাষীর বেগুন-উচ্ছে ফুলকপির সাথে যথেচ্ছভাবে মেশানো বিষ নয়, আমাদের পেটে যাওয়া 'আধুনিক' খাদ্যগুলির মধ্যে থাকা বিষগুলির প্রভাব নিয়ে কিন্তু ভাবার সময় এসে গেছে। এতো অ্যালার্জি, এতো চর্মরোগ, পাকস্থলী-অন্ত্রের এতো ক্যান্সার, এতো কিডনি খারাপ হওয়া —

এগুলির পেছনে এইসব কেমিকেলগুলির অবদান থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

বাচ্চাদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের 'Planned food' অবশ্যই খাওয়াবেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন! সুতরং বাবা-মায়েরা দৌড়লেন ছেলে-মেয়েদের জন্য Health drinks কিনতে। আবার ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা ভালো মনে রাখতে পারছে না? খাওয়ান Brain tonic। বাচ্চাদের যেকোন ধরনের বাস্তব বা কাল্পনিক অসুবিধা হলে — যেমন বাচ্চা (মায়ের চাহিদা মতো) ঠিক মতো বাড়ছে না, সঠিক পরিমাণে খাবার খাচ্ছে না — ইত্যাদিতে 'ভিটামিন টনিক' খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়ে পরে। এই প্রয়োজনটি, অর্থাৎ 'অসুখ' নির্ণয় এবং 'ভিটামিন টনিক' খাইয়ে তার চিকিৎসা করার প্রয়োজনীয়তা আবার সবই ঠিক করেন বাচ্চার মা-বাবারা। অনেকে আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে একটা ভালো ভিটামিন টনিক লিখে দেওয়ার জন্য ডাক্তারবাবুকে চাপও দেন। ডাক্তারবাবু এর পরেও না লিখে দিলে অনেকে আবার নিজেরাই ঔষধ দোকান থেকে বেশ দামী দেখে ভিটামিন টনিক কিনে তবে বাড়ি ফেরেন। এনাদের কে বোঝাবে যে, এইসব Health Tonic বা Vitamin Tonic বিক্রি করে দোকানদার, টনিক কোম্পানী, এমনকি ডাক্তারবাবুরও কিছু লাভ থাকতে পারে, বাচ্চাদের বা অন্যান্য টনিক খেকোদের কোন লাভ নেই। আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন আমরা আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য থেকেই পেয়ে যাই। ভিটামিন শরীরে জমাও থাকে না যে, বেশি করে খেলে ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগবে। অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত ভিটামিন বাচ্চা-বড় সবারই শরীরে দূরারোগ্য রোগের সৃষ্টি করতে পারে। আমরা কথায় কথায় যেসব মাল্টি ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স ওষুধ খাই, বেহিসাবীভাবে খেলে এগুলি শরীরে এক ধরনের মারাত্মক 'অ্যান্টিজেন' তৈরি করতে পারে — যা থেকে অ্যালার্জি ঘটিত অ্যাজমা ও অন্যান্য কয়েকটি মারাত্মক দুরারোগ্য রোগ হতে পারে। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ বিষয়ক সংস্থা — ফুড এন্ড ড্রাগ অথরিটি (FDA) বিশ্বজুড়ে এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া শরীরে লোহা বাড়ানোর জন্য 'ভূট্টা - flake', অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন বাড়ানোর জন্য দুধগুঁড়ো জাত 'Planned food' শরীরের জন্যই এগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের কোন টনিকই চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদন করেনা। দূরদর্শনে অ্যাপ্রণ পরে কেউ কিছু বললেই তা চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য হয়ে ওঠে না। ছাত্র-ছাত্রী বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা — সবার কাছেই এগুলি অপ্রয়োজনীয়।

গত কয়েক বছর ধরে একটি বিদেশি কোম্পানী নানান কিসিমের মনোহারী

জিনিসপত্র এবং 'টনিক' জাতীয় খাদ্যের পসরা নিয়ে হাজির, যাদের বাজারদরের দশগুণ দামের জিনিসপত্র নাকি এমন কোয়ালিটির — পৃথিবীতে কেউ কোনদিন তৈরি করতে পারেনি (এবং সম্ভবতঃ কোনদিন কেউ তৈরি করতে পারবে না!) বড় বড় চাকুরীওয়ালা কিছু মানুষ (এমনকি কিছু ডাক্তারবাবুও!) এদের প্রচারের জালে (এবং লভ্যাংশের আকর্ষণে) জড়িয়ে পড়ে এজেন্ট হয়েছেন। এদের দেখিয়ে এবং দেখে হাজার হাজার সাধারণবাড়ির বেকার ছেলেমেয়ে এই কোম্পানীর এজেন্ট হচ্ছে। কোম্পানীর সুস্পষ্ট আশ্বাস — অনিত্য এই পৃথিবীতে চাকুরী, ব্যবসা-সবই অনিত্য, চিরস্থায়ী কেবল এই কোম্পানীর সাথে যুক্ত এজেন্টদের মোটা কমিশন। আপনি এদের এজেন্ট হলে ছেলেময়ে ছেড়ে দিন, আপনার নাতি-পুতিদের ও তৎপরবর্তী প্রজন্মের স্থায়ী জীবিকা দিতে পারে এই কোম্পানী। সুদর্শন সাহেব-সুবোদের বক্তব্য সিডির মাধ্যমে অথবা ধোলাই হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের এবং জিনিস বিক্রি বা এজেন্ট নিয়োগের দ্বারা পকেট ভারী হওয়ার সম্ভাবনা লুব্ধ কিছু মানুষের সাজানো -গোছানো কথায় অধিকাংশ মানুষের মনে অবিশ্বাসের উন্মেষটুকুও আসতে পারে না। এনাদের ৫০০ গ্রাম টনিক পাউডারের দাম ৮৫০ টাকা, ১০০ গ্রাম মাজনের দাম ১১০ টাকা, এক বোতল সেন্টের দাম ১০০০ টাকা, বাসনমাজা তরল সাবান ৩৫০ টাকা — এইরকম সব ব্যাপার। তবে চেন রিয়েকশন **(Chain reaction)** তে চলা এই ব্যবসার এজেন্ট হওয়ার জন্য প্রত্যেকে হাজার পাঁচেক টাকা অফেরতযোগ্য ভাবে জমা রাখতে হয়, এই যা। গরীব-মধ্যবিত্ত বাড়ির হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে টাকা জমা দিয়ে মাল বিক্রি করতে না পেরে কোম্পানীকে এবং তাদের নিযুক্তকারী দালালদের ৭৫ : ২৫ অনুপাতে টাকাগুলি দিয়ে ঘরে ফিরে গেছেন। হাজার হাজার বেকার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ! এজেন্টদের মাধ্যমে জিনিসপত্র **forced sale** হলেও লাভ, আবার জিনিসপত্র বিক্রি না হলেও লাভ — মারাত্মক ধুরন্ধর মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত এই চক্রের অ-সাধারণ প্রচার আর বিজ্ঞাপনের বিছানো জালের কাছে গোয়েবেল্‌স তো শিশু!

আজকাল বাড়িতে কোন অতিথি এলে চা-বিস্কুট বা ফ্রিজ প্রত্যাগত ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা না করলে সম্মান থাকে না। এছাড়া 'দূষিত' নলবাহিত জলের বদলে বোতল ভরা 'মিনারেল ওয়াটার' পান করাও এখন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তো কয়েক মাস আগেই এগুলির মধ্যে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি নিয়ে এত হইচই হল। কয়েক মাস সামান্য কম হওয়ার পর ঠান্ডা পানীয়ের দোকানে আবার ভীড় বেড়েছে। 'ব্যবসায়িক গোপনতার' কারণে কোনো ঠান্ডা পানীয় কোম্পানী তাদের পানীয়ের সম্পূর্ণ ফর্মূলা জানায়

না। সুতরাং পানীয়ের সাথে মেশানো কেমিকেলগুলি ঠিক কি তা না জানার জন্য আমাদের শরীরে তাদের প্রভাব কেমন তা বোঝা যাবে না। তবে এই ব্যাপারে অতীতের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। অধুনা লুপ্ত এক ঠান্ডা পানীয় কোম্পানী একবার বেশ গর্ব করে প্রচার চালাল যে তাদের পানীয়তে B.V.O (Brominated Vegetable Oil) দেওয়া আছে। কিছুদিন পরেই জানা গেল এই পদার্থটি বিষাক্ত। এই নিয়ে হই-চই হতেই কোম্পানী প্রচার করতে লাগল, না না — তাদের ঠান্ডা পানীয়তে B.V.O নেই!

আইসক্রিম খেয়ে সোনামুখীতে অসুস্থ ৬৭ জন শিশু ও কিশোর

সোনামুখী ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকে ৬৭ জন আইসক্রিম খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এদের বয়স তিন থেকে ন'বছরের মধ্যে। বুধবার সকালে স্থানীয় একটি কারখানায় তৈরি আইসক্রিম খেয়ে ধুলাই ও রাঙামাটি ডি পাড়া পঞ্চায়েতের পাঁচটি গ্রামের এই শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মাথা ঘুরতে থাকে, পেটে ব্যথা এবং বমি শুরু হয়। অসুস্থদের সোনামুখী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। পরে শমিম মোল্লা নামে একটি তিন বছরের শিশুকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আনন্দবাজার, ২৯/৪/০৪

গ্রামবাংলায় 'আইসক্রিম' হল 'বরফ', অর্থাৎ স্যাকারিন ও কাপড় রং করার বা হোলির রং খেলার রং অপরিচ্ছন্ন জলে মিশিয়ে জমিয়ে তেরী করা বরফ। অবশ্য হাটে-বাজারে, বাসে-ট্রেনে, স্কুল-কলেজের সামনে ব্যাপক ভাবে বিক্রি হওয়া পলিথিন মোড়া বিভিন্ন রংয়ের 'পেপসি' জিনিসটিও একই পদার্থ। সামান্য পঞ্চাশ পয়সা বা একটাকার বিনিময়ে গরমে গলা ঠান্ডা করার জন্য অনেকেই এগুলি খান। বিষাক্ত রং বা দূষিত জলের বিষ সাধারণতঃ সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। ধীরে ধীরে লিভারের বা কিডনির ক্ষতি করে মারাত্মক সব রোগকে এরা ডেকে আনে ঠিকই, তবে সে সবের জন্য এইসব রঙিন খাদ্য-পানীয়ের রং দায়ী বলে মানুষ ভাবতে বা বিশ্বাস করতে পারে না। বাঁকুড়ার ঘটনায় সম্ভবত কোন একটি বিষের (দূষিত জল বা রং) পরিমাণ অত্যাধিক হয়ে গিয়েছিল।

গরমকালে বাচ্চাদের মধ্যে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা জল খাওয়ার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখা যায়। বড়রাও প্যাচ্‌পেচে গরমে ঘেমে-নেয়ে এসে ফ্রিজ-প্রত্যাগত ঠান্ডা জলে গলা ভেজাতে উৎসুক। এই অভ্যেসটি কিন্তু খুবই ক্ষতিকারক। সাময়িক স্বরভঙ্গ হওয়া থেকে শুরু করে টনসিলে মারাত্মক ধরনের সংক্রমণ

হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর যারা আগে থেকেই গলা বা টনসিলের কোন অসুখে ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে এই অভ্যেসটি মারাত্মক বললেও কম বলা হবে।

এরপর বাচ্চাদের প্রিয় চকোলেট ও চুয়িংগামগুলির প্রসঙ্গে আসা যাক। কয়েকমাস আগে চকোলেটে পোকা পাওয়া নিয়ে একপ্রস্থ হই-চই হল। চকোলেট নিয়ে আসল সমস্যা এর মধ্যে মাছির ডিমপাড়া ও ডিম থেকে লার্ভা বেরোনো নিয়ে নয় (লার্ভাই 'পোকা')। আগেকার দিনে 'লজেন্স' আর 'চকোলেট' আমজনতার কাছে সমার্থক ছিল। 'লজেন্স' বাচ্চারা চুষে খায়, সেজন্য মুখের লালার সঙ্গে মিশে এগুলি পেটে যায়। সস্তার লজেন্সের বিষাক্ত রং বিষক্রিয়া করতে পারে (যেমন ট্রেনে ফেরি হওয়া লাল-নীল-সবুজ-হলুদ লেবুগন্ধী লজেন্স), কিন্তু চকোলেট থেকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আরো অনেক বেশি। চকোলেট খাওয়ার সময় এর একটা অংশ অবশ্যই বাচ্চাদের দাঁতের ফাঁকে আটকে যায়, যা খুব ভালো করে ব্রাশ না করলে বেরোয় না। চকোলেট খেয়ে কোন বাচ্চাই ব্রাশ করেনা, আর তাই দাঁতের ফাঁকে থেকে যাওয়া চকোলেটের মধ্যে খুব সহজেই জীবাণুরা বংশবৃদ্ধিকরতে পারে। ফলে দাঁতের বাহিরের লেয়ার এনামেল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজকাল বাচ্চাদের এতো দাঁতের রোগ হওয়ার একটা বড় কারণ চকোলেট খাওয়া। কিন্তু এও একটা দিক মাত্র। চকোলেট বা চুয়িংগামের মধ্যে যেসব কেমিক্যাল দেওয়া থাকে, তাদের অনেকগুলিরই বাচ্চাদের শরীরে ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। ১৯৯২ সালে লক্ষ্ণৌ-এর এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর এক গবেষণা রিপোর্টে ভারতে উৎপাদিত চকোলেটে উচ্চমাত্রায় নিকেলের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রমাণ হাজির করা হয়। এদের রিপোর্ট অনুসারে হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবিল ওয়েল ব্যবহার করার কারণে চকোলেট উৎপাদন করার সময় উচ্চ তাপমাত্রায় নিকেল চকোলেটের মধ্যে মিশে যায়। যথারীতি এই রিপোর্ট নিয়ে কিছুদিন হই-চই হয়, একসময় সব ঠান্ডা হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের, বিশেষতঃ মহিলাদের সকালের প্রাতঃরাশ হয়ে দাড়িয়েছে এক পেয়ালা চা আর দুটি বিস্কুট। এছাড়াও অবশ্য সারাদিন আরো কয়েকবার চা অনেকেই খান, আর বাড়িতে অতিথি এলে সামাজিকতা রক্ষা করার জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুটি খাদ্য পানীয়ই এগিয়ে দেওয়া হয়। চা খিদেনাশক, সেজন্য চা খেলে খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়। শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগানোর জন্যই খাওয়ার প্রয়োজন, সেজন্য চা খেয়ে খিদে কমিয়ে রাখা কোন কাজের কথা নয়। এছাড়া প্রতিদিন সকালে খালিপেটে চা খেয়ে দুপুর অবধি কিছু না খেয়ে থাকাও মারাত্মক। খাদ্য না খেয়ে খিদে মেরে দিয়ে কাজকর্ম করে যাওয়া

আর বেতো ঘোড়াকে প্রহার করে কাজকর্ম করানো — দুটোই একই রকম ব্যাপার। পাকস্থলীতে অ্যাসিড ও হজমী খাদ্যরস (Hydrochloric Acid & Enzymes) দীর্ঘ সময় জমা হয়ে থাকার কারণে পাকস্থলীর দেওয়ালে ক্ষত বা ফুটো হয়ে গিয়ে জীবন-সংশয় হতে পারে (Gastric Ulcer, Gastric Perforation)। খুব বেশি চা খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক সমস্যাও তৈরি হতে পারে। এছাড়া চায়ের মাধ্যমে কিছু কিছু রোগও ছড়ায়। দুধ-চিনি মেশানো চায়ের একটা অংশ সব সময়ই স্টীলের ছাকনির মধ্যে আটকে থাকে। জল দিয়ে ধুয়ে এগুলি পরিস্কার হয় না। আর প্রতিদিন চায়ের ছাঁকনি খুলে সব সময় ধোয়ার রেওয়াজ অধিকাংশ বাড়িতে নেই। ছাঁকনির মধ্যে থাকা পচে যাওয়া দুধ প্রতিদিন চায়ের সাথে মিশে গিয়ে রোগ ছড়াতে পারে। এছাড়া সস্তার চা কি জিনিস থেকে তৈরি হয় আর কি কাজ করে — যে সম্পর্কে পরে এক সময় আলোচনা করা যাবে। সাধারণতঃ চায়ের সঙ্গী হয় এক বা দুইটি বিস্কুট। বিস্কুট কোন 'খাওয়ার' মধ্যে পড়ে? এতো কম পরিমাণ ময়দা দিয়ে এতো বড় সাইজের খাদ্যবস্তুটি তৈরী হয়, যে এটি খেতে যতোই মজার লাগুক, এর খাদ্যমূল্য খুব বেশী নেই। সেজন্য চা-বিস্কুট কোন 'খাওয়া' নয়।

তিন

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিজের আনন্দ বা দুঃখকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য অন্নপ্রাশন, বিয়ে, বৌভাত, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন থেকে শ্রাদ্ধ — এইসাব অনুষ্ঠানগুলি চালু হয়েছিল। একজন মানুষের কাছের মানুষরা ঐ মানুষটির অনুভূতিগুলির শরিক হতেন এভাবেই। আধা-পশ্চিমী কেতায় এখন এইসাব অনুষ্ঠানগুলি পুরোপুরি 'আনুষ্ঠানিক' হয়ে গেছে। প্যান্ডেল-ক্যাটারার শোভিত অনুষ্ঠানগুলি এখন শুধুই লৌকিকতা। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির কর্তার কাছে নেমন্তন্নের চিঠি একটি বিভীষিকা। মুখে স্বীকার করেন না, তবে 'শুভ বিবাহ' বা 'শুভ অন্নপ্রাশন' লেখা কার্ড পিওন হাতে ধরিয়ে দিলে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় না, এমন বাঙালি বিরল। চারহাতি গামছায় সারা শরীর জড়ানোর চেষ্টা করার মতো টানা-হেঁচড়া করে সামাল দেওয়ার চেষ্টায় জেরবার সাংসারিক বাজেটের কাছে নেমন্তন্ন এক বিষম উৎপাত। এরপর যথারীতি 'কর্তা' মশায়কে বাড়ির মেয়েদের 'মান' রাখার জন্য এমন উপহার কিনতে হয়, যাতে 'দশজনের' কাছে ওনাদের 'মুখ' থাকে। অথচ এর অন্য পিঠটি দেখুন! মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি মেয়ে তার বিয়েতে যে পরিমাণ শাড়ি-

জামা-কাপড় উপহার পায়, তা দিয়ে একটা ছোট-খাট দোকান দেওয়া যায়। এতো শাড়িতো কেউ পরতে পারে না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেই আনন্দ! এছাড়াও উপহার মেলে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একাধিক সংখ্যার, যা কোন কাজেই লাগেনা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, বুদ্ধিমতী-বোকা — বাঙালি মেয়ে মাত্রেই শাড়ি-গহনার জন্য পাগল, এই প্রচলিত ধারণার শুরুটা হয়েছিল বোধহয় এখান থেকেই। তবে মেয়েদের এই ধরনের মানসিকতা জন্মানোর পেছনের কারণগুলোও বিশ্লেষণ করা দরকার। যেকোন বিয়েবাড়িতে বা বৌভাতের অনুষ্ঠানে দেখাবেন মা-ঠাকুমা বা পিসি-মাসির নির্দেশে কম বয়সি মেয়েরা একটি হিসেব রাখার খাতা নিয়ে কনে বা নুতন বউয়ের পাশে বসে আছে। উপহারদাতার সামনেই প্যাকেট খুলে কে কি উপহার দিল তা দেখে খাতায় হিসাব রাখছে। গরীব আত্মীয়-স্বজন কোন কমদামী উপহার দিলে উপহারটির আর্থিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করে (অনেক সময় বড়দের দেখাদেখি ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে) উপহার ও উপহার দাতার নাম খাতায় টোকা হয়। একবারও উপহারদাতার অপমানের দিকটির কথা কারুর মনে পড়ে না। বাচ্চা মেয়েগুলোর মনে এখান থেকেই সৃষ্টি হয় একদিকে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে দামী উপহার দেওয়ার ও অন্যদিকে আর্থিক ভাবে অসচ্ছল মানুষকে হেয় করার শিক্ষা। এই ধরনের বেশ কিছু সামাজিক Training পরবর্তীকালে এদের নিজস্ব যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার উপযোগী মন গঠনে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের মেয়েদের এমনিতেই বোঝা-জানার সুযোগ অনেক কম, তাই সাধারণতঃ মেয়েদের জগতে খেলা, রাজনীতি, সাধারণ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখার কোন জায়গা থাকে না। এর উপর একদম বাচ্চা বয়স থেকেই মা-ঠাকুমা-দিদা থেকে মাসিমা-পিসিমা-কাকিমা-বৌদি-দিদি — সবাইয়ের শাড়ি-গহনা বা সাজগোজ নিয়ে এইরকম হ্যাংলামীপনার যে প্রভাব পড়ে তার বাইরে সাধারণতঃ কোন মেয়েই আর ভবিষ্যতে বেরোতে পারে না।

সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য করা এইসব অপ্রয়োজনীয় খরচ এভাবেই বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোর অস্বাভাবিক মানসিক গঠন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এর প্রভাব পরবর্তীকালে হয় অপরিবর্তনীয়, কারণ এই অস্বাভাবিকতাকে লালন-পালন করতেই তারা শেখে, তাই অস্বাভাবিকতাই তাদের কাছে হয়ে যায় স্বাভাবিকতা। তাছাড়া এমনি এমনিই কেউ না কেউ আমাকে আমার ভালোলাগার জিনিসগুলো দেবে — এই অনুভব কখনোই কোনকিছু অর্জন করতে শেখায় না। সেজন্য ভবিষ্যতে এদের সঠিকভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনাটুকুও লুপ্ত হয়ে যায়।

এরপর আসা যাক নেমতন্ন বাড়ির খাওয়ার কথায়। এটি একটি বিচিত্র ব্যাপার! দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে সরকারি আনুকূল্যের কারণে বিরাট বিরাট ফার্ম তৈরি করে ডিম-পাড়া মুরগীর (Layer) চাষ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি এরা ভালো সংখ্যায় ডিম পাড়ে, তারপর ডিমের সংখ্যা কমতে থাকে। যেসব মুরগী ডিম পেড়ে পেড়ে দুর্বল ও অলাভজনক হয়ে যায়, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ,তাদের ফার্ম থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই জায়গায় কমবয়েসি মুরগী বাচ্চাদের ঢোকান হয়। ফার্ম থেকে বাতিল হওয়া এইসব মুরগীর শরীরে অবশ্য ছিবড়ে আকৃতির কিছু 'মাংস' আর হাড় ছাড়া কিছু থাকে না। বিয়ে বাড়ির 'সিজন' গুলিতে এইসব মুরগী গাদা-গাদা আমাদের রাজ্যে আমদানী করা হয়, কারণ ফার্মগুলি নামমাত্র মূল্যে এগুলি বেচে দেয়। এইসব মুরগীর মাংসে নরম আর সু-স্বাদু করার জন্য ভিনিগার (Acetic acid) বা আজিনামোটোর (Monosodium Glutamate) মতো কিছু কেমিকেল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। মাংসের মধ্যে এসব কেমিকেলের স্বাদ যাতে বোঝা না যায়, তার জন্য ক্যাটারারের রান্না করা মাংস বেশ একটু 'রীচ' করে রান্না করা হয়। তবু মশলা সরিয়ে মাংসের টুকরোগুলো চেটে দেখলে একটু টক টক স্বাদ টের পাওয়া যায়। এরসাথে ঘি-এর নামে ভেজাল মেশানো বনস্পতি দিয়ে তৈরি করা পোলাও, দিন পনেরো বরফ চাপা দিয়ে রাখার পর সারাদিন দোকানে সাজিয়ে রেখেও বিক্রী না হওয়া পচা মাছকে হলুদ-জলে হাল্কা সেদ্ধ করে ফোটা তেলে ছেঁকে কড়া করে ভেজে 'টাটকা' করা 'বিলাসপুরী পোনামাছে'র ঝোল, ঐ মাছের পচে-গলে যাওয়া নাড়িভুঁড়ি মিশিয়ে তৈরি করা তেতো-শাক, ঐ মাছের মুড়ো দিয়ে তৈরি করা মুড়িঘন্ট ও ডাল এবং নানান বিষাক্ত রং ও ভেজাল মেশানো সস্তার মশলা দিয়ে রান্না করা নানান তরকারি একের পর এক খেয়ে যান। এরপর ময়দা ও তেঁতুলবিচির গুঁড়োজাত 'দুধ', ডালডা নামক ঘি, বিস্কুট গুঁড়ো এবং চিনি-পোড়ান রং মিশিয়ে তৈরি করা ফ্রিজে জমানো মিষ্টি দই খেয়ে নিন। এরপর মাস খানেকের পুরানো ছানার কয়েকবারের রং-রূপ বদল করার পর তৈরি হওয়া বর্তমান রূপের মিষ্টি খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুরটা তুলুন Cold drinks খেয়ে। খবরদার দাঁত-মুখ ধোবেন না! বাটিতে সাবান-গুঁড়ো মেশানো গরমজল রাখা আছে, হাত ধোওয়ার ও কাগজের টুকরো রাখা আছে মুখ মোছার জন্য। এরপর মুখশুদ্ধি দেওয়া হচ্ছে — পলিথিন প্যাকেটে মোড়া লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রং মেশান মিষ্টির দানা সহ পানমৌরী। এই হল 'নেমন্তন্ন বাড়ির' খাওয়া। কতো বিচিত্র ধরনের বিষ একসঙ্গে পেটে

যায়! সব বিষতো সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে না — তবুও খবরের কাগজে বিয়েবাড়ির ভোজ খেয়ে অসুস্থ হওয়ার খবর কিছু প্রায়ই বেরোয়। তবুও ভোজ খাওয়ার নেশা আমরা ছাড়তে পারবো কি?

ভোজ খেয়ে অসুস্থ ৭০

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : বিয়েবাড়ির ভোজ খেয়ে ৭০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শনিবার পুলশিটা গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। অসুস্থদের কোলাঘাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্য দফতর ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে স্থানীয় এক যুবকের বৌভাতের ভোজ খেয়েই এই বিপত্তি। বিকেল থেকেই অনেকের বমি হতে শুরু করে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বিষক্রিয়ার ফলেই এই ঘটনা। — **আনন্দবাজার, ৩০/৫/০৪**

মেয়ের বিয়েতে স্বর্ণলঙ্কার দেওয়া এখন আর শুধুমাত্র একটি সামাজিক প্রথা বলে গণ্য করা যায় না, এখন এটি হয়ে গেছে সব মেয়ের বাবা-মায়ের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ধনীদের কথা বাদই থাক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ির কর্তা থেকে -পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে দিনযাপন করা মহিলা সবাই সবসময় নিজের সামর্থ ও ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য 'গয়না'র ব্যবস্থা করতে থাকেন। এত গরীব দেশ হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণালঙ্কার শিল্প পৃথিবীতে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে কেবলমাত্র এই কারণেই। উৎপীড়িত মেয়ের-বাবার কাছে বিয়ের খরচের মধ্যে সবচেয়ে বড় খরচ সোনা কেনার খরচ। অথচ সোনা জিনিসটি সত্যি সত্যি কি কাজে লাগে? সোনার গহনা পরে রাস্তাঘাটে বেরোলে তা হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরোনো। সেজন্য 'সোনার জল' দেওয়া নকল গহনা কিনে রাখতে হয়। এগুলি থেকে অন্য ধরনের সমস্যারও উদ্ভব হতে পারে। যেমন ধরুন সোনার আংটির তলায় শৌচকর্ম করার সময়কার মল ও অন্যান্য জমে থাকা নোংরা খাবারে মিশে গিয়ে এগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যারও কারণ হতে পারে। গরীব-নিম্নবিত্ত বাড়িতে এইসব সোনার গহনা থাকে ট্রাঙ্কের কোটরে, আর মধ্যবিত্ত উচ্চ বিত্তদের থাকে ব্যাঙ্কের ভাড়া করা লকারে। মাঝে মধ্যে ট্রাঙ্ক খুলে বা ব্যাঙ্কের লকার খুলে দেখতেই যা আনন্দ! (সে তো যে কোন সোনার দোকানে গেলে বিনামূল্যে দেখা যায়, তাই না?)।

আজকের দিনে সোনা কোনরকম আর্থিক নিরাপত্তা যোগানোর ক্ষমতা রাখেনা। আজকের কেনা সোনার গহনা কাল বেচলে শতকরা চল্লিশ ভাগ দাম কম পাওয়া যায়। (পারিশ্রমিক, খাদ ইত্যাদি বাদ!) তার উপর গত দশ বছর

আগে সোনার যা দাম ছিল, এখন তার দাম তার থেকে অনেক কম। এই দশ বছরে জমানো টাকা সাড়ে তিন-চার গুণ হয়ে গেল — কেনা সোনার বেচার দাম হয়ে গেল কেনার অর্ধেকেরও কম! সুতরাং একটু অন্যভাবে বললে বলা যায় এটি মেয়েদের একটি নেশাদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েদের সোনা বা শাড়ি-জামা-কাপড়ের প্রতি থাকা অন্ধ নেশা থেকে কতো যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় প্রতিদিন, তার কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। কোনো মেয়ের ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র গড়ে উঠেছে কিনা তা বোধহয় শুধুমাত্র সোনা-শাড়ি-জামাকাপড়ের প্রতি নেশা আছে কিনা — এটুকু পরীক্ষা করলেই অনেকটা বোঝা যায়।

সাধারণ একটি পরিবারের কয়েক দশকের তিল তিল করে সঞ্চয় করা অর্থ সামাজিক বিয়ে সংক্রান্ত এইসব ভৌতিক সংস্কারের পেছনে খরচ হয়। অবস্থার চাপে পড়ে আজকাল কিছু কিছু শিক্ষিত ছেলের মনে এইভাবে রক্ত জল করে উপার্জন করা টাকাগুলো নষ্ট করার বিরুদ্ধে মত জন্মালেও সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর কুমারী মেয়েদের মানসিক গড়নের উপর এসবের কোন প্রভাব পড়ে না। পিসি-মাসি-দিদিদের বিয়ে যেমন করে হয়েছে — তার বাইরে অন্য কোন কিছুকে মেনে নেওয়ার মতো মানসিক জোর অর্জন করার মতো শিক্ষা না পাওয়ার কারণে এই ধরনের 'ব্যয়কে' কোন 'অপব্যয়' বলেই এদের মন ভাবতে পারে না। মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির প্রায় সব মেয়েই তাই প্যান্ডেল-ক্যাটারার-খানা-পিনা-গহনা-শাড়ি-উপহার সামগ্রী সহ বিয়ের স্বপ্নই দেখে। এই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বাবার ফতুর হয়ে যাওয়ার দিকটা এদের নজরে পড়ে না। বিয়ের জন্য বরপণ দাবী করা অনেক পাত্রের বক্তব্যই হল 'বিয়ের খরচ জোগাড় করার জন্য' পণ নিতে হয়। মেয়ে জন্মালেই সেজন্য মা-বাবার মনে তার বিয়ের খরচ নিয়ে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, তা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সমাজে কন্যা সন্তানের আগমনকে হাসিমুখে মেনে নিতে না পারা থেকে শুরু করে কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণের জন্য বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন — এসব সমস্যাগুলো এক একটা পৃথক কোন সমস্যা নয় — সবগুলোই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের আদিবাসী সমাজের, বিশেষতঃ সাঁওতাল সমাজের মেয়েদের দেখে আমাদের শেখা উচিৎ। এরা অনেকটাই সাবলম্বী, তবে তা কারো উপর নির্ভর করে থাকা বা ফাঁকিবাজির মাধ্যমে পাওয়া 'সাবলম্বন' নয় — পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সত্যিকারের সাবলম্বন। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে তাই এরা গায়ে কেরোসিন ঢালার কথা ভাবে না, 'তোর সনে থাকব নাই' বলে সোজা হাঁটা দেয়। পরে মনের মিল হলে নির্বাচন করে নতুন সঙ্গী। এই ধরনের

মানসিকতা অর্জন করা সোজা কথা নয়, ল্যাতপেতে গড়পড়তা বাঙালী মেয়েরা কোনদিন এই মানসিকতা অর্জন করতে পারবে কি?

বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের এই বঙ্গদেশে মেলার অভাব কোনদিনই ছিল না। বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কালীপূজা থেকে শুরু করে চৈত্রের গাজন-চড়ক — নানান ঠাকুর দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে অতীতে নানান মেলার আয়োজন করা হত এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে। অতীতকালে ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি মানুষের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জায়গা ছিল এইসব মেলা। আজকাল অবশ্য নানান 'হুজুগে' মেলার উৎপত্তি হয়েছে। সরকারি আনুকূল্যে বিভিন্ন জায়গায় এইরকম 'মেলা' বসানো হচ্ছে। এইসব মেলাগুলি চলে দোকানদারদের থেকে আদায় করা চাঁদা আর নানারকম জুয়া বসানোর টাকা থেকে। এই অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ আয়োজক রাজনৈতিক মাতব্বরদের কাছে পৌঁছেও যায়। গ্রামাঞ্চলের এইসব মেলার ক্রেতা অধিকাংশই মেয়েরা। 'সংসারের টুকিটাকি' কেনা-কাটার নামে কিছু অপ্রয়োজনীয় মনোহারী জিনিস কেনার জন্য সন্ধের সময় এইসব মেলায় দারুণ ভিড় থাকে। পুরুষরা সন্ধ্যার পরে এসব মেলায় যান জুয়া খেলতে বা মদ খেতে। এছাড়া কিছু অস্থায়ী রেস্টোরেন্টে এগরোল-চাউমিন বা অস্থায়ী তেলেভাজা, মিষ্টি দোকানের কিছু অখাদ্য খাওয়ার জন্যও কমবয়েসী ছেলে-মেয়েদের ভীড় থাকে। মফঃস্বলে হওয়া এই ধরণের মেলার আশেপাশে ঠেক তৈরী করে অপেক্ষা করেন শহরের বাতিল যৌনকর্মীরা। সেজন্য রাতে মেলা দেখতে গিয়ে কমবয়েসী ছেলেদের কিছুক্ষণ হারিয়ে যাওয়া অনেক সংকেতই বহন করে আনে।

চার

প্রতিটি মানুষ চায় তাকে সুন্দর দেখাক। আয়নায় চুল আচড়ানো, সুন্দর পোশাক পরা — এসব মানুষ করতে চায় এই উদ্দেশ্যেই। তবে বিজ্ঞাপনের উস্কে দেওয়ার কারণে সাজগোজ করা নিয়ে আজকাল মানুষের সচেতনতা অনেক বেড়েছে। মেয়েদের উপযোগী প্রসাধনী বিক্রি করার বাজার বহুদিন আগে থেকেই বেশ তেজী। আজকাল ছেলেদেরও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার করানোর জন্য নানান মিডিয়ার মাধ্যমে প্রসাধনী উৎপাদক কোম্পানিগুলি চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিদিন বেরোচ্ছে নানান কেমিকেল প্রলেপের বিজ্ঞাপন, যাতে কালো হবেন ফর্সা, কুদর্শন-কুদর্শনারা হবেন সুদর্শন-সুদর্শনা, মোটা হবেন রোগা, রোগা হবেন মোটা, মাথার পাতলা চুল হবে ঘন — এমন হাজারো সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি নিয়ে কোম্পানিগুলি হাজির। সেজন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলির নির্দেশমতো

প্রতিদিন শ্যাম্পু করা, লিপস্টিক, রুজ, আইল্যাশ থেকে বডি লোশন, আফটার শেভ ব্যবহার করা -এসব করতেই হয়। মানুষের শারীরিক গড়ন, চামড়ার রং, চুলের গড়ন, চোখের গড়ন, সৌন্দর্য্য — এগুলি প্রায় পুরোটাই বংশগত, অর্থাৎ জন্মানোর আগেই ঠিক হয়ে যায়। শরীরের চামড়ার উজ্জ্বলতা, শরীরে চর্ব্বি জমা হওয়া, চোখের কোনে কালি পড়া বা গালে মেছেতি (দাগ) পড়া — এগুলি একজন মানুষের খাদ্যাভ্যাস, হজমশক্তি, জীবন-যাপন, — এরকম অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। শুধুমাত্র শরীরের বাইরের অংশে (চামড়ায়) কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করে এগুলি স্থায়ীভাবে বদল করা সম্ভব নয়। যা সম্ভব - তা হল অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের সঠিক গড়নটি লুকিয়ে রাখা। সেই উদ্দেশ্যেই বাজার জোড়া এতো কেমিক্যালের ছড়াছড়ি। এদের মধ্যে কোনটা হয়ত কিছুদিনের জন্য চামড়ার উজ্জ্বলতা সামান্য বাড়াতে পারে বা এরকম কিছু — এগুলি চামড়ার পক্ষে আরো ক্ষতিকারক। রোগা মানুষকে মোটা করার জন্য Anabolic Steroid জাতের ঔষধ ব্যবহার করার মতোই এগুলিও মারাত্মক, যা ভবিষ্যতে নানান ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দিতে পারে। এইসব কেমিক্যালগুলি কোনভাবে পেটে গেলে (যেমন ঠোঁট চাটার, দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস থাকলে বিষাক্ত লিপষ্টিক বা নেলপালিশ পেটে যেতে পারে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি) তা মারাত্মক হতে পারে, বিশেষতঃ লিভার বা কিডনির ক্ষেত্রে।

বাজারে যেসব প্রসাধনী পাওয়া যায়, তার উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল পেট্রোলিয়াম জেলি, খনিজ তেল, জৈব তেল, মোম, নানান ধরনের পশুচর্বি, কৃত্রিম রাসায়নিক রং ও গন্ধ এবং উপাদানগুলিকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত পচন রোধক নানা পদার্থ। এগুলির কোনটিরও চামড়ার মধ্যে কোন স্থায়ী পরিবর্তন আনার ক্ষমতা নেই - তবে প্রতিটিরই ক্ষতিকারক নানান ক্ষমতা আছে। যেকোন ঔষধ আবিষ্কারের পর বাজারে আমাদের ব্যবহারের জন্য আসার আগে তাকে অনেকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এটাই নিয়ম। অথচ কস্‌মেটিক্‌সগুলির জন্য এরকম কোন কড়াকড়ি নিয়ম নেই। তবে কস্‌মেটিক্‌স উৎপাদনকারী বড় বড় কোম্পানিগুলি এগুলিকে ‘পরীক্ষিত’ বলে প্রচার করেন। চামড়ার পক্ষে এগুলির কতোখানি নিরাপদ তা বোঝার জন্য এইসব কেমিক্যালগুলি কিভাবে ‘নিরাপদ’ বলে বাজারে ছাড়পত্র পায়, তার আলোচনায় আসতে হবে। এই ধরনের কোন কেমিক্যাল মানুষের চামড়ার জন্য নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করা হয় গিনিপিগ-খরগোসদের মতো জীবেদের চামড়ায় সেগুলির প্রভাব পরীক্ষা করে। অবশ্য এই পরীক্ষা করা হয় কিছুদিনের জন্য। প্রথমতঃ মানুষের চামড়ার গড়ন আর গবেষণাগার-জীবেদের চামড়ার গড়ন, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ (Body System)

এক নয়। দ্বিতীয়তঃ এইসব পরীক্ষা হয় খুব অল্প সময়ের জন্য — আর খরগোস-গিনিপিগদের আয়ুও খুব কম। সেজন্য এইসব কেমিক্যালগুলির পরবর্তীকালে কোন ক্ষতি করে কিনা (Long term effect) তা পরীক্ষা করা হয়না। বহুজাতিক বড় বড় কোম্পানীর চাপে বাজারে ব্যবহারের ছাড়পত্র সহজেই মেলে, তবে আপনি এগুলি ব্যবহার করার আগে যেসব মানুষ বিভিন্ন কারণে এগুলি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করে এসেছেন, তাদের আসল মত নিন (যেমন চলচ্চিত্র-শিল্পী)। কিছুদিন এগুলি ব্যবহার করার পর চামড়ার এমন অবস্থা হয়, যে এগুলি ব্যবহার না করে স্বাভাবিক অবস্থায় লোকসমাজে বেরোনো যায় না। আর বড়ো কোম্পানিকে নকল করে যেসব ছোট ছোট স্থানীয় কোম্পানি সস্তায় এই ধরনের প্রসাধনী উৎপাদন করে, এরা কি কেমিক্যাল কতোটা মেশায়, তা এরাই জানে। কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়টুকুও এদের নেই। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাড়ির মেয়ে-বৌরা এগুলিই ব্যবহার করেন। সবার অজান্তে এগুলি কাজ করেই চলে, তবে পরে একসময় এগুলি ব্যবহারের কুফল নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। বাজারে নানান ধরনের শ্যাম্পু (Shampoo) -র আমদানী যতো বাড়ছে, মানুষের চুল নিয়ে সমস্যাও ততো বাড়ছে। আমার ছেলেবেলায় আমি এতো বেশিহারে টেকো মানুষ দেখিনি।

প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি চলে আসা এক সংস্কার হল বিবাহিতা হিন্দু নারীদের সিঁথিতে সিন্দুর পরা। সীমন্তে সিন্দুর — হিন্দু নারীর এক চরম ধর্মীয় সংস্কার। কতো কাব্য, কত গল্প উপন্যাস, মায় কতো না মফঃস্বল-হিট-সিনেমা তাই নিয়ে। এই সিন্দুর আজকাল আর কোন জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয়না। তার বদলে এমন সব বিষাক্ত ধাতুজাত কেমিক্যাল তৈরি হয়, যাতে সিঁথি ও আশেপাশে চুলকানি, চুল উঠে যাওয়া, ঘা হওয়া — এমনকি ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য যেকোন প্রসাধনী ব্যবহার করার আগে এগুলির সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবগুলির কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

পোশাক-আশাক এখন আর কেবলমাত্র শরীর রক্ষা বা লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য কোন বিষয় নয়, লোকজনকে দেখানোর ও ফ্যাসন অনুসরণেরও বিষয়। আধুনিক বাঙালির পোশাক-আশাক হল কিছুটা হিন্দীভাষী মানুষদের নকল, আর বাকিটা হল ইউরোপ-অ্যামেরিকার নকল। ব্যবহার করা সহজ বলে উত্তর-ভারতের সালোয়ার-কামিজ, চোস্তা-পাঞ্জাবী বা ইউরোপের প্যান্ট-শার্ট-কোট ও ম্যাক্সি-মিডি — এসব আমরা ব্যবহার করি। অবশ্য এই গরমের দেশে ধুতি-পাঞ্জাবীর থেকে প্যান্ট-শার্ট আরামদায়ক কিনা, সেটা অন্য প্রশ্ন। আমাদের পূর্বপুরুষরাই দিশী সাহেব হয়ে আধুনিক হতে গিয়ে এই প্রথাগুলি

চালু করে দিয়ে গেছেন। সুতোর পোশাক-আশাক (বিশেষতঃ অন্তর্বাস) যতোটা আমাদের শরীরের কাছে উপকারী, কৃত্রিম তন্তুর পেশাক ঠিক ততোটাই ক্ষতিকারক। ফাইবারের পোশাক দেখতে সুন্দর, সস্তা, সহজে ইস্ত্রি করা যায় — এসব কারণে সুতোর তুলনায় এই ধরনের পোশাক অনেক বেশী বিক্রী হয় সারা পৃথিবীতে। তবে ঘাম শুষে নিয়ে তা বাষ্পে পরিণত করে শরীর ঠাণ্ডা রাখার যে গুণ সুতোর তৈরি পোশাকের আছে, কৃত্রিম তন্তুর তৈরি পোশাকের সেই গুণ নেই। অন্যদিকে গরমকালে চামড়ার সংস্পর্শে কৃত্রিম তন্তু দীর্ঘক্ষণ থাকলে চামড়ার কোষগুলি উত্তেজিত হয়ে নানান চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

আজকাল ইউরোপ - আমেরিকার ফ্যাসান অনুসরণ করে আমাদের দেশের কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে 'রোগা' হওয়ার প্রতি এক প্রবল অনুরাগ এসে গেছে। রোগা হওয়ার এই হুজুগে খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেওয়া বা যখন তখন উপবাস করার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক চেষ্টাগুলি করা হয়। এতেও ওজন 'ঠিকমতো' না কমলে অ্যামফিটামিন বা ফেনফ্লুরামিনের মতো নিষিদ্ধ ঔষধও অনেকে খান। এই ধরনের অভ্যাস কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। শারিরীক গঠন অনেকটাই বংশানুক্রমিক — জোর করে তা বদলাতে গেলে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয় না। কমবয়স থেকে কম খাওয়া কারণে শরীরের হাড় ও মাংস পেশীগুলি চিরতরে দুর্বল গড়নের হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রক্তহীনতা সহ শরীরের অন্যান্য অনেক স্থায়ী সমস্যার উদ্ভবও এভাবে হতে পারে। আর ঔষধ খেয়ে রোগা হতে গিয়ে হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতিও হতে পারে। তবে রোগা হওয়ার যেকোন চেষ্টাতেই মারাত্মক অ-ক্ষুধা রোগ (Bu-limia এবং Anorexia nervosa) ও মানসিক অবসাদ রোগ (Mental depression) শরীরে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে পারে।

আধুনিক জীবন যাপনের অঙ্গ হিসাবে জুতো আমরা সবাই পরি। সব রকমের ফ্যাশান সবার আগে মেয়েদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। কমবয়েসি মেয়েদের মধ্যে আজকাল উঁচু গোড়ালির (High heal) জুতোর ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। (ছেলেদের মধ্যে এইরোগ এতোটা ছড়াতে পারেনি, তবে একজন বিখ্যাত বাঙালি সিনেমা নায়ক নাকি অভিনয় করার সময় চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু হীলের জুতো ব্যবহার করেন!)। আমাদের পায়ের পাতার কাজ হল হাটা-চলা করার সময় আমাদের শরীরের ওজন বহন করে শরীরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য বিবর্তনের নির্দেশে গোড়ালি আর পায়ের পাতার বাকি অংশের গঠন নির্দিষ্ট হয়েছে। সেক্ষেত্রে হঠাৎ করে গোড়ালিকে অস্বাভাবিক অবস্থানে থাকতে বাধ্য করলে তার ফলতো ভুগতে হবেই। বাচ্চা বয়স থেকে হাই-হীল জুতো পরার

কারণে মেয়েদের কোমরের পেশীর গঠন বিকৃত হয়ে যেতে পারে। ফলে পরবর্তীকালে সন্তানধারণ ও প্রসব করার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া একই কারণে একটু বেশি বয়স হলেই হতে পারে কোমরের যন্ত্রণা-বাত — যার কোন স্থায়ী নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা নাই। অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের দৌলতে শহরাঞ্চলে তুলোর গদি-তোষক ব্যবহারের দিন শেষ হয়ে গেছে। কৃত্রিম স্পঞ্জের নরম গদি আর বালিশ ছাড়া অন্য কিছু বাড়ির খাটে পাতা থাকলে সেটা সামাজিক মান-সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই গদি বালিশের কল্যাণেও ঘাড়-কোমরের ব্যথা আর বাতের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শহুরে ভাবাপন্ন মানুষজনের যেকোন ধরনের পরিশ্রমেই অনীহা এসে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে মানুষ নিজের পায়ে হাঁটতে ভুলে যাচ্ছে। এদিকে যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তারা মাংস, মাছ, ডিম, তেল-ঘি দিয়ে তৈরি করা নানা 'আধুনিক' খাবার খেতে পছন্দ করেন। রেষ্টোরেন্টে তৈরি হওয়া এইসব খাবারগুলি প্রায় সবই উচ্চ ক্যালোরীযুক্ত, (যেমন পিজ্জা, সসেজ ইত্যাদি)। এইসব উচ্চ ক্যালোরীযুক্ত খাবার খেতে পছন্দ করার কারণে শরীরে মেদ জমে যাওয়া ও অন্যান্য নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অত্যাধিক চর্বি জমে যাওয়ার কারণে শহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশেরই আকৃতি হয়ে যাচ্ছে পিপের মতো। পরিশ্রম বিমুখতা, আলু-ডিম-বাটার-ফাস্ট ফুডের মতো উচ্চ ক্যালোরীর খাবার খেয়ে যাওয়া, প্রাত্যহিক দিবানিদ্রা দেওয়া ছাড়াও শারীরিক ওজন হিসাবের মধ্যে না এনে একই ডোজে সব বয়সের মেয়েদের খেয়ে যাওয়া কনট্রাসেপটিভ হর্মোন পিলের প্রভাবও এর পেছনে আছে বলে অনেকের ধারণা।

দুরদর্শনের ব্যপক প্রসারও মানুষের আলসেমি বেড়ে যাওয়ার এক বড়ো কারণ। সিরিয়াল দেখার নেশায় পাওয়া মানুষজনদের অনেকের তো সামাজিক জীবন বলে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। গল্প-গাছা করা, আড্ডা দেওয়া — এসব বাঙালি সমাজ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। রোজগারের ধান্দা করার পরে বাকি সময়টা দুরদর্শন দেখে আর তা না হলে নেশা করে কাটানোতেই এখনকার মানুষের বেশি উৎসাহ। ছেলে-মেয়েরাও অবসর সময়টা দুরদর্শনের প্রোগ্রাম দেখেই কাটিয়ে দিচ্ছে। বই পড়া, গান শোনা — এসব প্রায় বন্ধ হওয়ার যোগাড়। এইভাবে বাঁচতে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক, বন্ধুহীন মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এই নিঃসঙ্গতার কারণে নিজের মানসিক চাপ হালকা করার কোন পথ না পেয়ে মানসিক অবসাদে ভোগা ও মানসিক ভারসাম্য হারানো রুগীর সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

ভেজাল খাদ্য কথা

এই যুগ আধুনিক যুগ, এই যুগ ভেজালেরও যুগ। ভেজালের এই যুগে ভেজাল সব কিছুতেই। সেজন্য খাদ্যে ভেজাল ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। সাধারণতঃ দামে সস্তা করা, ওজন বাড়ানো অথবা রঙচঙে আকর্ষণীয় করার জন্য খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশান হয়, আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই ভেজাল শরীরের পক্ষে হয় ক্ষতিকারক। ভেজাল খাদ্যের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই তেল-মশলা, দুধ, আটা-ময়দার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ভেজালের কথাই আমাদের মনে আসে, তবে দোকান-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন খাদ্য উপকরণ বা তৈরি করা খাবার খুব কমই আছে যাতে ভেজাল নাই। ভেজালের উপকরণ এবং ভেজাল মেশানোর পদ্ধতিতে অনেক 'আধুনিকতা' এসে গেছে, আর তাই চিংড়ি সাঁতরানো দুধ বা রেপসীড তেল মেশানো সর্ষের তেলের মতো ব্যাপারগুলো back dated হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে নতুনত্ব হল ভেজালের সাথে ভেজাল মেশানো। যেমন ধরুন সর্ষের তেলে মেশানো রেপসীডটাও ভেজাল। কয়েক বছর আগে কলিকাতার বেহালা অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ ভেজাল রেপসীড খেয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণভাবে যে সব ভেজাল আজকাল চলছে তার মধ্যে আছে সর্ষের তেলের সঙ্গে রেপসীড তেল বা পাম তেল ছাড়াও মবিল, শিয়াল কাঁটার তেল বা আর্গামোন তেল মেশানো; দুধের সঙ্গে আলু পাউডার, ইউরিয়া, বাতাসা বা স্যাকারিন মেশানো; গুঁড়ো লঙ্কার সঙ্গে বালি, মাটি, কাঠের গুঁড়ো, গায়ে মাখা পাউডার এবং আলকাতরা থেকে তৈরি কৃত্রিম রং মেশানো; হলুদে হলুদ রঙে রঞ্জিত ময়দা বা ধুলো মেশানো এবং হলুদকে আরও হলুদ করার জন্য বিষাক্ত মেটানিল ইয়োলো (metanil yellow) এবং লেড ক্রেমেট (Lead chromate) মেশানো; আটার সঙ্গে নরম পাথরের গুঁড়ো, চকখড়ির গুঁড়ো ও কলিচুন মেশানো; পোকা ধরা ছোলা, মটর ও নানান রকমের ডাল থেকে বেসন তৈরি করা, আর ঘিয়ের সঙ্গে ডালডা (বনস্পতি) এবং ডালডার

সঙ্গে পশু চর্বি এবং মোম মেশানো। আগে ব্যবহৃত চায়ের পাতার সঙ্গে Ferrous Sulphate নামের এক লৌহঘটিত লবনের দ্রবণ মিশিয়ে চা পাতাকে 'তাজা' করা হত। এখন বিশেষাবে তৈরি চামড়ার গুঁড়ো, কৃত্রিম রং আর গন্ধ মিশিয়ে চা বলে বিক্রী হচ্ছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? দোকানের ফেলে দেওয়া চা পাতাগুলোকে একটু হাতে ঘষে দেখুন, বিশ্বাস হবে।

এরপর দইয়ের কথা একটু ভাবা যাক। দোকানে কেনা মিষ্টি দইয়ের সাজা নিয়ে এসে বাড়িতে দই বসানোর চেষ্টা করুন তো। ময়দা, তেঁতুলবীচির গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দুধ, চিনি পোড়ান রঙের সঙ্গে মিশে দই হচ্ছে, আর ঐ দুধে মেশান ডালডা হয়ে যাচ্ছে ওপরের মোটা সর।

এখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং সহজে পরীক্ষা করা যায়, এমন কয়েকটি ভেজালের কথা আলোচনা করা যাক ঃ

১) মেটানিল ইয়োলো (Metanil Yellow) ঃ এটি ব্যবহার করা হয় পোকা ধরা মুগডাল ও অখাদ্য শুকনো গোটা হলুদকে হলুদ করার জন্য। ডাল বা হলুদ জলে ঝাঁকিয়ে সেই ধোয়া জলকে এমনভাবে জল মিশিয়ে পাতলা করতে হবে যাতে মিশ্রণের রং বোঝা না যায়। এরপর ঐ মিশ্রণ একটু নিয়ে তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ঘন হাইড্রোক্লোরিড অ্যাসিড (Conc. HCl) মেশালে লালচে বেগুনী রং এসে যাবে।

২) লেড ক্রোমেট (Lead Chromate) ঃ এটিও ডাল বা গোটা হলুদে মেশান হয় তা উজ্জ্বল হলুদ করার জন্য। পাঁচ গ্রাম ডাল বা হলুদ নিয়ে পাঁচ মিলিলিটার জল মিশিয়ে ঝাঁকাতে হবে। এরপর ঐ মশলা ধোয়া জলে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিড অ্যাসিড দিলে ঐ দ্রবনের রং হালকা গোলাপী (Pink) হয়ে যাবে।

৩) লাল রং ঃ এটি শুকনো লঙ্কার ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়। একটুকরো তুলোতে একটু তরল প্যারাফিন (Paraffin Liquid) মিশিয়ে শুকনো লঙ্কার গায়ে ঘষলে তুলোতে লাল রং উঠে আসবে।

৪) আলকাতরা জাত রং (Coal tar dye) ঃ এই ধরনের বিভিন্ন রং বিভিন্ন জিনিসকে রঙ্গীন করতে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আজেবাজে জিনিসকে চায়ের রং করে চা হিসাবে বিক্রি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়। কাচের পাত্রে অল্প কলিচুন (Soaked Lime) ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর চায়ের অল্প কিছু গুঁড়ো বা পাতা ছড়িয়ে দিতে হবে। খাঁটি চায়ের পাতার ক্ষেত্রে একটা হালকা সবুজাভ হলুদ রং ফুটে ওঠে; লাল, বেগুনি বা অন্য রং ভেজাল প্রমাণ করে।

৫) বনস্পতি ঃ এটি ঘি বা মাখনের সঙ্গে প্রায়শঃই মেশান হয়। টেষ্ট টিউবে

এক চামচ ঘি / মাখনের সাথে এক চামচ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাতে হবে। এরপর কয়েকটি শর্করাদানা বা চিনি মেশাতে হবে। পাঁচ মিনিট ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পর টেষ্টটিউবের তলায় ঘন লাল রং দেখা যাবে।

৬) ঘিয়ের কৃত্রিম রং ঃ ঘি বা মাখনের একটুখানি নিয়ে ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে কয়েক ফোঁটা জল মেশালে লাল রং দেখা যাবে।

৭) আলুসেদ্ধ ঃ ঘি বা মাখনের সঙ্গে আলুসেদ্ধ মেশান আছে কিনা তা জানার জন্য একটু ঘি বা মাখন নিয়ে কয়েক ফোঁটা আয়োডিন মেশাতে হবে। দ্রবণের রং নীলাভ হয়ে যাবে।

৮) মবিল (Mineral Oil) **ঃ** মেশিন চালানোর বদলে ভোজ্য তেলের সঙ্গে অনেক সময় মবিল মেশানো হয়। দুই মিলিমিটার তেলের সঙ্গে সমপরিমাণ N/2 Alcoholic Potash মেশাতে হবে এবং জল গরম পাত্রের (Water bath) মধ্যে পনের মিনিট ফোটাতে হবে। এরপর দশ মিলিলিটার জল মেশালে দ্রবণ অস্বচ্ছ (hazy) হয়ে যাবে।

এছাড়া কড়াইতে তেল গরম করলে মবিল ধোঁয়া হয়ে উঠে যাবে, কারণ সর্ষের তেলের স্ফুটনাঙ্ক থেকে মবিলের স্ফুটনাঙ্ক অনেক কম।

৯) ক্যাস্টর ওয়েল (Castor Oil) **ঃ** এটিও ভোজ্য তেলের সঙ্গে মেশানো হয় অনেক সময়। কয়েক ফোঁটা ভোজ্য তেল নিয়ে একটু পেট্রোলিয়াম ইথার (Petrolium ether) মিশিয়ে Deep freeze তে চার মিনিট মতো রাখলে দ্রবণ অস্বচ্ছ হয়ে যাবে।

ভাগ্য গণনা — বিজ্ঞানের চোখে

দৃশ্য এক ঃ রাস্তার মোড়ে পলিথিন বিছিয়ে অপরিষ্কার জামা-কাপড় পরা খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি-গোঁফ ভরা মুখ নিয়ে বসে থাকা এক ভাগ্য-গণক। পাঁচ টাকা দিলেই তার সামনে রাখা খাঁচার মধ্যে বসে থাকা টিয়া পাখিটি এক গোছা ভাঁজ করে রাখা কাগজের টুকরো থেকে একটি ঠোঁটে তুলে ধরে। সেই কাগজের টুকরো খুললেই আপনি জেনে যাবেন আপনার ভাগ্য। কি? আপনার এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস নেই, তাই না?

দৃশ্য দুই ঃ বিখ্যাত সোনা ও গ্রহরত্নের দোকান। দোকানের এক পাশে একটি স্বল্পালোকিত ছোট্ট ঘরে গেরুয়া বা লাল বসনধারী সুদর্শন পুরুষ, সুন্দর করে সাজানো বড় বড় চুল, কপালে লাগানো সিন্দুরের লাল তিলক, সযত্নচর্চিত দাড়ি-গোঁফের প্রভাবে একটা পবিত্র-পবিত্র ভাব শরীরে এনে অথবা মহিলা হলে সুন্দর-সংযত বেশ, অল্প কিন্তু উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত প্রসাধনের প্রভাবে একটা জগন্মাতা ধরনের ভাব শরীরে এনে আপনার কোষ্ঠী বা হাত দেখে যখন অতীতের অনেক কথা বলে দেন এবং বর্তমানের সমস্যাগুলি থেকে বেরোনোর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রহরত্নটির হদিস ও ব্যবহার বিধি আপনাকে বুঝিয়ে দেন, আপনি অভিভূত হয়ে যান, তাই না?

আপনার আমার সবারই নিজের ভবিষ্যত জানার কৌতূহল আছে। তবে প্রথম ক্ষেত্রে আপনি সহজেই বুঝে যান যে ব্যাপারটি বুজরুকি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব, ভাগ্য-গণকের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি, আপনার অতীত-বর্তমানের কিছু ব্যাপার বলে দেওয়া — এ সবই আপনাকে প্রভাবিত করে ভাগ্য গণনায় বিশ্বাসী হতে, প্ররোচিত করে গ্রহরত্ন কিনতে। সুতরাং এটি বুজরুকি নয়। তাই না?

ভাগ্যগণকরা ঠিক কি কি বলেন, একটু খেয়াল করুন তো! কখনওই সরাসরি কোন কথা এনারা বলেন না। যেমন — আপনার ছোটবেলায় একবার

টাইফয়েড হয়েছিল, বা আপনি তিন সন্তানের পিতা অথবা আপনার স্বামীর পায়ে একজিমা আছে — এসব ওনারা বলেন না। অন্যরা বলেন, "আপনার ছেলেবেলায় একটা ফাঁড়া (বিপদ) গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভেবে নেন গণৎকার আপনার ছেলেবেলায় হওয়া টাইফয়েডের কথা বলতে চেয়েছেন। আসলে গ্রামাঞ্চলে বড় হওয়া যেসব মানুষজনের বয়স এখন ৪০-৪৫ এর উপর, তারা ছেলেবেলায় হয় খারাপ ধরনের অসুখে ভুগেছিলেন আর নয়তো কোন বিপদে পড়েছিলেন। খুব ভালো স্বাস্থ্যের কয়েকজন হয়তো এই দলে পড়েন না, আর গণৎকার মশায় তাদের একথা বলবেনও না। ভাগ্যগণক হয়ে যারা বসেন, তারা জানেন ঠিক কোন কথাটি কোন মানুষের মনে ধরবে। সবসময়ই এমন কিছু কথা বলবেন, যার সরাসরি কোন অর্থ হয় না, অথচ শ্রোতা তার অর্থ নিজের মতো করে নেবেন, অর্থাৎ কিছুটা ভাসা ভাসা কথা।

এরপর ভাগ্যগণক মশায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের চাকুরিজীবি মধ্যবিত্ত কোন পুরুষের হাত দেখে খাতায়, ভূর্জপত্রে বা মেঝেতে নক্সা কেটে কিছু হিসেব করে বললেন "আপনার ব্যাপারটা বুঝলাম। আসলে আপনাকে সংসারের কেউ বুঝল না...." এখন ঘটনা হল এই বয়সের পুরুষদের সবাইয়ের মনে এই অনুভূতিটি বর্তমান যে, সংসারে তাকে কেউ বুঝল না! কাজেই গণৎকারমশাই এই ধরনের কথা ঠিকমতো করে বলতে পারলে তা সঠিক নিশানায় লেগে যাবেই। এই ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে — যেমন শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাদের চোখে বৌমারা সব অত্যাধুনিকা, গুরুজনদের যত্ন-সম্মান করে না, নিজেদের সাজ-গোজ, পোষাক-আশাক নিয়েই মশগুল। আর উল্টোদিকে আধুনিকা গৃহবধুদের চোখে শ্বশুর-শাশুড়িরা সব সেকেলে, সবসময় শুধু বৌমাদের দাবিয়ে রাখতে চান। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা ৩০-৩৫ বয়সী গৃহবধুকে যদি ভাগ্যগণক বলেন "আপনার কৈশোরে / স্কুল জীবনে (শনির প্রভাবে) একবার খুব বড়ধরনের সমস্যা হতে যাচ্ছিল। (মঙ্গল/বৃহস্পতির প্রভাবে) আপনি সেই সময় বেঁচে গেছেন। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে গৃহবধূটি চমকে যাবেন। অথবা ধরুন মধ্যবয়সী গৃহবধূ, যিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে খারাপ ধরনের সমস্যায় পড়েছেন, তাকে যদি ভাগ্য-গণক বলেন "আপনাকে তো দুঃখ পেতেই হবে। আপনি পাপ করেছেন / আপনি কোন মানুষকে জীবনে দুঃখ দিয়েছেন বলেই আপনাকে কর্মফল ভোগ করতে হচ্ছে।" একটা বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর মানুষ মাত্রেই নিজের মনের অন্তঃস্থলে কোন না কোন পাপবোধে ভোগেন! সেজন্য শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে গণৎকারের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। অনেক ক্ষেত্রে আবার কোন মানুষকে এক নজরে দেখে অনেককিছু সহজেই

বুঝে নেওয়া যায়। উদাহরণ — খিটখিটে, রোগা, অম্লরোগী মানুষ সাধারণতঃ কর্মক্ষেত্রে চাপ ও সংসারে নানান অশান্তির কারণে মানসিক সমস্যাতেও ভোগেন।

যেকোন মানুষের জন্মগত (জিনগত) বৈশিষ্ট্য তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। এরপর মানুষটির বড় হওয়ার সময়কার, অথবা ভালভাবে বলতে গেলে বেঁচে থাকার সময়কার পারিপার্শ্বিক পরিবেশও এই ব্যাপারে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মানুষটির শিক্ষা, সাংসারিক ও সামাজিক পরিবেশ — এরা তৈরি করে দেয় মানুষটির রুচি। এই সবকিছু মিলিয়েই তৈরি হয় একটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক গড়ন। ভাগ্যগণনা ব্যাপারটির মধ্যে খুব দ্রুত একজন মানুষের মানসিক বিশ্লেষণ করে নেওয়া হয় (সাইকো অ্যানালিসিস)। একজন মানুষের কথাবার্তায়, মুখের মানচিত্রে, শারীরিক ভাষায় (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) শরীরের চামড়ার গড়নে, পরে থাকা জামা-কাপড়ের রং, ধরণ, পরিচ্ছন্নতা ও দামে, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে — এমনকি চশমার ফ্রেমের গড়নের মধ্যেও টুকরো টুকরো ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি এগুলিকে দেখতে পারেন, পড়তে জানেন, তিনি এগুলি বুঝে নিয়ে হয়ে যান সত্যিকারে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। আর যিনি এই বিষয়গুলিকে খুব কম সময়ের মধ্যে বুঝতে পেরে এগুলি থেকে ব্যক্তিটির সম্পর্কে অনেক কথা আন্দাজ (গেস) করে নিতে পারেন, তিনিই কেবলমাত্র হতে পারেন একজন ভালো ভাগ্যগণক। অবশ্য শুধু জানা-বোঝাতেই হয় না, ভালো ম্যাজিসিয়ান হওয়ার মতোই ভালো ভাগ্যগণক হওয়ার জন্য প্রয়োজন অধীত বিদ্যার প্রচুর অভ্যাস করা। এছাড়া এই কাজে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাকচাতুর্য, ভালো অভিনয় ক্ষমতা, খুব কম কথায় মানুষের মনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা, উপযুক্ত শারীরিক গড়ন, বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব ('গ্র্যাভিটি' না থাকলে রপ্ত করা 'ভ্যানিটি'), যে কোন কথাকে গুছিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে বলার ক্ষমতা এবং সাজসজ্জা করা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা আবশ্যক।

একজন ধর্মভীরু মানুষ যতোই জ্ঞানী হোন না কেন একজন তান্ত্রিকের বড় বড় চুল-দাড়ি, লাল বা গেরুয়া পোষাক-আশাক, মাথায় লাল টিপ্, অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে সামনে রাখা ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, উপস্থিত সমস্ত বিশ্বাসীদের শ্রদ্ধা-প্রণাম — এসব সহজে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। মানুষের মনে পরিবেশের একটা প্রভাব সবসময়ই পড়ে। ভূত অবিশ্বাসীদের একা একা নির্জন শ্মশানে অন্ধকারে রাত জেগে থাকতে হলে তারা এটা সবচেয়ে ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন। একইরকম ভাবে গণৎকার মশায়ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মানুষকে প্রথমেই কিছুটা প্রভাবিত করেন। এরপর কোন মানুষের দুর্বল জায়গা কোনটি — তা একজন ভালো ভাগ্যগণক সহজেই বুঝে যান।

এরপর ঠিক কি ধরনের কথাবার্তা বলে একজন মানুষকে প্রভাবিত করা যাবে, এটা ওনারা প্রথমেই ঠিক করে নেন। কিছু সাধারণ (কমন) বিষয় অনেক মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হলেও সাধারণতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই কথায় কাজ হয় না। বিভিন্ন স্তরের ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাসী, বিভিন্ন স্তরের সংস্কারে অভ্যস্ত মানুষ, বিভিন্ন বয়স ও অভিজ্ঞতার মানুষ — এইসব বিষয়গুলি চট করে বুঝে নিয়ে সেই মতো পদ্ধতি অনুসরণ করার উপর ভাগ্য-গণকের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে। তবে যেভাবেই হোক, কারো সম্পর্কে কিছুটা খবর আগাম জানা থাকলে ভাগ্যগণনা ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে যায়। অনেক সময় সামান্য দু-একটি প্রশ্নের উত্তর পেলেই গণকমশাই বাকিটা বুঝে নেন। এরপর সেই বোঝা কথাগুলিকে গুছিয়ে বলতে পারলেই বাজিমাত! কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের বাড়িতে একাধিক বিবাহযোগ্যা কন্যা ও বেকার ছেলে থাকার খবর জানা থাকলে সেই ব্যক্তির মানসিক বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়, আর তাই ভাগ্যগণনা পুরোপুরি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

আমাদের দেশে সন্তান জন্মানোর সময় থেকে বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার ভাগ্য জানতে আর তার নিয়ন্ত্রণ করতে। সেই উদ্দেশ্যেই জন্মলগ্ন জেনে সন্তানের কোষ্ঠী তৈরি করানো হয়। এইরকম সন্তান বড় হয়ে ভাগ্য-নির্ভর হয়ে পড়বে — এটাই স্বাভাবিক। এখনও অধিকাংশ বাঙালি বাড়িতে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে কোষ্ঠী বিচার করে রাশি-গণ ইত্যাদি মেলানো হয়। পৃথিবীতে কোন দুটি মানুষের সবকিছুই একরকম নয় — সম-দর্শন যমজদেরও নয়। সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে মাত্র বারো ধরনের মানুষ আছেন (বারোটি রাশির) — এই মতবাদে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কিভাবে বিশ্বাস করেন তা বোঝা দুষ্কর।

এবার একটু অন্য কথা। 'অ্যাস্ট্রোনমি' ও 'অ্যাস্ট্রোলজি' দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। 'অ্যাস্ট্রোনমি' বা মহাকাশ বিজ্ঞান হল আধুনিক বিজ্ঞানের একটি শাখা – যেখানে মহাজাগতিক বস্তু পিণ্ড, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি থেকে ব্ল্যাকহোল — এসবের চর্চা করা হয়। চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ, বা শুক্র গ্রহে রকেটের সাহায্যে অভিযান করে তথ্য সংগ্রহ করা এই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে 'অ্যাস্ট্রোলজি' বা জ্যোতিষবিদ্যাকে আজকের দিনে কোন বিজ্ঞান বলে স্বীকার করা হয় না। আধুনিক সভ্যতার প্রথম দিকে যখন বিজ্ঞান-দর্শন-ঈশ্বর — এসব নিয়ে আলাদা করে চর্চা করা শুরু হয়নি, তখন মহাজাগতিক গ্রহ-নক্ষত্র ও মানুষের উপর তাদের প্রভাব নিয়ে তৎকালীন বড় বড় দার্শনিকেরা একই সঙ্গে চর্চা করতেন। সেই সময় মনে করা হত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আছে আমাদের গ্রহ পৃথিবী, আর পৃথিবীকে ঘিরে সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য বাস্তব-অবাস্তব গ্রহ নক্ষত্ররা ঘুরে

বেড়াচ্ছে। এই পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিন্যাসের যুগের কল্পনাগুলোকে এখনও 'অ্যাস্ট্রোলজি' বলে চালান হচ্ছে। এখন 'অ্যাস্ট্রোলজি'কে বিজ্ঞানের নামে গালগল্প ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। চতুর ধর্ম ব্যবসায়ীরা অবশ্য দুটো বিষয়কে গুলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে দুটো বিষয়কে একই বলে প্রচার করেন। যাইহোক, সূর্যের কিছু গ্রহের নাম ও অন্য কিছু কাল্পনিক মহাজাগতিক বস্তুর নাম নিয়ে তৈরি করা হয় শত্রু-মিত্র কিছু 'গ্রহের' নাম (শনি, মঙ্গল, রাহু ইত্যাদি)। মহাকাশের এইসব 'গ্রহের' রশ্মি সমূহকে ধরে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিছু রঙ্গিন পাথর — এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করেই চলে বিশ্বব্যাপী গ্রহরত্ন ব্যবসা। এছাড়া পাথরগুলি কাউকে সহ্য হবে কিনা দেখার জন্য বালিশের তলায় কয়েক দিন রেখে ঘুমানো বা এগুলি ধুয়ে প্রতিদিন জল খাওয়া ইত্যাদি নানান নিয়মকানুন গ্রাহকদের বলা হয় মনের সংস্কারগুলিকে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে। আপনার জানা জগতে এমন মানুষ নিশ্চয়ই আছেন যিনি বলবেন তার অমুক তান্ত্রিকের দেওয়া তমুক পাথরে ভীষণ কাজ হয়েছে। মানসিক জোর কমে যাওয়া দিশাহীন মানুষকে কথার ফাঁদে ফেলে পাথর বিক্রি করলে শুধু সবসময় যে ভাগ্য-গণক বা পাথর দোকানদারের লাভ হয়, তা নয়। মানসিকভাবে দুর্বল, নিজের উপর আস্থা হারানো মানুষের মধ্যে যদি এই সব পাথরের প্রভাবে মানসিক জোর বাড়িয়ে জীবনের পথে লড়াই করার ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সেই মানুষটির জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এই মানুষটি এরপর নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে পারলে বা ঘটনাচক্রে এরকম কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে সারাজীবন সেই ভাগ্য-গণক ও পাথরের সুনাম করে চলরেন। এক্ষেত্রে ভাগ্য-গণক মশায়ের মাধ্যমে পাথরটি 'সাইকিয়াট্রিস্ট' -এর কাজ করল। এই ভাবেই একদল মানুষ (পড়ুন ভাগ্যব্যবসায়ী) সুচতুর ভাবে ফাঁদ পেতে রেখেছেন আর আমরা জীবনের নানা সমস্যায় বিচলিত হয়ে গিয়ে দুর্বল মানসিকতার শিকার হয়ে সেই ফাঁদে নিজেরাই ধরা দিচ্ছি।

ঃ সহায়ক পুস্তকাদি ঃ

1. O.P.Ghai and P. Gupta : Essential Preventive Medicine -- A Clinical and Applied Orientation. Vikash Publishing House, New Delhi.

2. Michael J. Pelczar, E.C.S. Chan, Noel R. Kreig ; Microbiology (5th Edition) Tata-MC. Graw-Hill Publishing Co., New Delhi.

3. M. Sarkar, A. Banerjee and P.P.Pramanik ; Fluorosis - science Reporter-June 2004 issue. National Institute of Science Communication and information resources, C.S. I.R., Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012.

4. Parvinder Chawla and Hassan Jawid Khan ; Poisoned Waters ! Science Reporter Oct.'2004 issue ; National Institute of Science Communication and information resources, C.S. I.R., Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012.

১। খাবার নিয়ে ভাবার আছে – উৎস মানুষ সংকলন (২০০২)

২। আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ এপ্রিল ২৮, ২০০৪; এপ্রিল ২৯, ২০০৪; মে ৩০, ২০০৪; জুলাই ৫, ২০০৪ ; জুলাই ১২, ২০০৪;

৩। দৈনিক বর্তমান ঃ সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৪

৪। আপনি ও আপনার স্বাস্থ্য ঃ ডাঃ ভি.এন. ভাবে, ডাঃ এন. এস. ডিওডার এবং ডাঃ এস. ভি. ভাবে (১৯৯৪) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী-১৬

৫। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ঃ উৎস মানুষ সংকলন - প্রকাশক ঃ পি. মুখোপাধ্যায়, বি.ডি. ৪৯৪, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-৬৪।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের আহার করতে হয়। কিন্তু এই আহারই আমাদের বেঁচে বর্তে থাকার মেয়াদকে তিলে তিলে কমিয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে রাত অবধি আমরা যা খাদ্য গ্রহণ করছি, উদর পূর্তির জন্য, রসনা তৃপ্তির জন্য, পুষ্টির জন্য— তা আমাদের শরীরে বিষ হয়ে প্রবেশ করে আমাদের বেঁচে থাকার সময়সীমাকে ক্রমহ্রাসমান করছে প্রতিদিন। বিজ্ঞাপনী চমকের আড়ালে শিশুর পুষ্টিকর পানীয় আসলে কি বস্তু? 'ভেজাল শিল্প' কত উন্নত মানের হয়েছে জানলে আশ্চর্য হতে হয়। ঠাণ্ডা পানীয় থেকে জ্যাম, জেলি, সস্, সরষের তেল থেকে আলু, পটল, চাল ডাল— এই ভেজাল শিল্পের বাইরে নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানান প্রথা, সংস্কার, কুসংস্কার, অভ্যাস। ড. শিবব্রত পট্টনায়কের কলমে এই বিষময় জীবনযাপনের চিত্রমালা। 'আহারে বিষ মগজে বিষ' এক অমোঘ সতর্কবাণী।